ইসলামী আইন
বনাম
মানব রচিত আইন

শহীদ সাইয়েদ
আবদুল কাদের আওদা

আবদুল কাদির আওদাহ্ শহীদ (মিসর)

ইসলামী আইন

বনাম

মানব রচিত আইন

মাওলানা কারামত আলী নিযামী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন
আবদুল কাদির আওদাহ শহীদ (মিসর)
মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ৯৮৫/৪
ইফাবা গ্রন্থাগার ৩৪০.৫৯
ISBN 984-06-0383-3

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৮১

পঞ্চম সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৭
বৈশাখ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
তাজুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ৬০.০০ টাকা।

ISLAMI AIN BANAM MANAB RACHITA AIN (Islamic Law vs. Man-Made Law) : Written by Abdul Qadir Audah Shahid in Arabic, translated by Maulana Karamat Ali Nejami into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone 8128068 April 2007

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-Mail Info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 60. 00 ; US Dollar : 2.50

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশকের কথা

একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, পরিপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত জীবনবিধান হিসাবে ইসলামের আইন সর্বযুগে ও সর্বসময়ে প্রয়োগযোগ্য। পবিত্র আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর মূল ভিত্তি। ইজমা ও কিয়াসের প্রয়োগ একে আরও জীবন্ত করেছে। ইসলামী আইন ইসলামী শরীয়তেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী আইন বা শরীয়ত ইসলামের মৌল দর্শন ও নীতিমালারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। যা তাওহীদ, ঈমান, ইবাদত, ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম, অপরাধ, সামাজিক আচরণ, উত্তরাধিকার, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইসলাম কোন ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক জীবন-ব্যবস্থা নয়। এ থেকে সুফল পেতে হলে একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। ইসলামী বিধান দাওয়াত, তা'লীম ও এর প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনই জীবন্ত রূপ ধারণ করে না। এ থেকে সুফল পাওয়া যায় না। একে মানুষের কল্যাণে কার্যকর করা যায় না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের দুনিয়ায় অন্যতম বৃহত্তম ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের 'প্রতিষ্ঠা'র দিকটি মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত।

আজকের মুসলিম সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত ও তা'লীম জারি থাকলেও এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার অভাবে ইসলামের সুফল থেকে দুনিয়াবাসী দারুণভাবে বঞ্চিত। ফলে অনৈসলামী আইন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাপে মুসলিম সমাজ আজ একদিকে যেমন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্‌র বাস্তবায়নেও পিছিয়ে পড়েছে। ইসলামী আইনের সত্যতা, বাস্তবানুগতা এবং তার গতিশীল ব্যাপকতার কথা আমরা মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও তাকে বাস্তবায়ন করতে পারছি না এবং এ ক্ষেত্রে অগ্রসরও হচ্ছি না।

এর কারণ কি ? মিসরের বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ শহীদ তাঁর লিখিত 'ইসলাম বাইনা জিহলে আবনায়িহী ওয়া ইজমে উলামায়িহী' এবং 'ইসলাম ওয়া আওযায়া নাল কানূনীয়া' পুস্তক দু'টিতে এর কারণ উদ্‌ঘাটন করে ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সাথে মানব রচিত আইনের অসারতা ও অপূর্ণতা ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত 'ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন' শীর্ষক এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামী আইনের প্রায়োগিক দিকটির সাথে সুধী পাঠকদের পরিচিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালে গ্রন্থটি প্রথম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আশা করি এ গ্রন্থ পাঠে ইসলামী আইনের সুফল ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারবেন এবং ইসলামের এ উপেক্ষিত দিকটি বাস্তবায়নে সকলে উদ্যোগী হবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার ও তা বাস্তবায়নের তাওফীক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উৎসর্গ

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের
বীরসেনানী শহীদানের উদ্দেশে
— অনুবাদক

লেখক পরিচিতি

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের নিশানবরদার মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' দলটি একটি খালেস ইসলামী দল। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলন ছিল খালেস দীনী আন্দোলন। সুতরাং সে যে সর্বদাই হক ও সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা তার রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকার ক্ষেত্রে দুর্বিষহ নিপীড়ন ও অত্যাচার বরণ করার দ্বারাই বোঝা যায়। প্রত্যেকটি সত্য আন্দোলনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম এ-ই চলে আসছে যে, তার পতাকাবাহীদের উপর বিপদ-আপদ ও নির্মম জুলুম-অত্যাচারের জগদ্দল পাথর মাঝে মাঝে এসে চেপে বসেছে। সুতরাং এমনিভাবে বিভিন্ন স্বাভাবিক পর্যায় অতিক্রম করার পর ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনটিও তদানীন্তন মিসরের ফিরআউনী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জালিমশাহীর জুলুম-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল।

বাদশা ফারুকের শাসনামলে ১৯৪৮ সনে প্রথমবার এ আন্দোলনকে মিসরে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এক এক করে সমস্ত ইখওয়ান নেতাকে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। অতঃপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নকরাশী পাশাকে হত্যা করার মিথ্যা ষড়যন্ত্র বানিয়ে তার উপর গুলী ছোঁড়া হয়েছিল। আর এটাকে একটি অজুহাত খাড়া করে বহু ইখওয়ান কর্মী ও নেতাকে নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল অথচ তখন এ আন্দোলনের সর্বোচ্চ আমীর হাসানুল বান্না সাহেবও নক্রাশী পাশার হত্যাকান্ডের জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করতে কসুর করেন নি। কিন্তু শাসকবর্গ তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তাঁকে আমন্ত্রণ করে রাজদরবারে এনে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কোনক্রমে বন্দী করতে না পেরে পথে যাবার সময় তার প্রতি গুলী চালিয়ে হত্যা করা হলো। এ মহান নেতার জানাযার খাট তাঁর বৃদ্ধ পিতা ও পরিবারের নারীগণ ব্যতীত অপর কোনও লোকেরই বহন করার সুযোগ ছিল না। কারণ বাদশাহ তখন দেশের সাধারণ জন-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার অজুহাতে মুসলমানদেরকে তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এর পরই বের হয়েছিল বাদশাহ ফারুকের জানাযার খাট।

জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে দুনিয়ার একমাত্র রক্তপাতহীন বিপ্লব ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নৈতিক সাহায্য ব্যতীত কোনক্রমেই পূর্ণতা লাভ করতে পারতো না। তাঁর সক্রিয় সাহায্যেই জেনারেল নজীব বাদশাহ ফারুককে বিতাড়িত করে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে নিতে পেরেছিলেন। এমনিভাবে সুয়েজ খাল থেকে বৃটিশকে

তাড়ানো আন্দোলন ও ফিলিস্তিনে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ত্যাগ ও কুরবানীর ভূমিকা সম্পর্কে স্বয়ং মিসরীয় শাসকবর্গ ভালরূপেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই ইখ্ওয়ানের দীনী ও রাজনৈতিক খিদমত সম্পর্কে বেশ অবহিত ছিল। কিন্তু পরে কি হলো? কর্নেল নাসের জেনারেল নজীবকে সহায়হীন করে তাঁর থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে মিসরের বুকে স্বীয় প্রভুত্বের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে ভেঙে দিয়ে 'হাদিয়াতুত তাহরীর' নামে একটি একক সরকারী দল প্রতিষ্ঠিত হলো। আর ইখ্ওয়ানকে ঐ দলে শামিল হবার জন্য আহ্বান জানালো। কিন্তু ইখ্ওয়ান শর্তহীনভাবে শামিল হতে সম্মত না হলে তার প্রতি নাসের খুবই রাগান্বিত হলেন। এরপর নাসের সরকার ও বৃটিশের মধ্যে সুয়েজ খাল নিয়ে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলে ইখ্ওয়ান প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালো। ফলে দেশময় নাসেরের বিরুদ্ধে হৈ চৈ পড়ে গেল এবং ভীষণ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এ সময় নাসের ইখ্ওয়ানকে আইনগতরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তার সমগ্র নেতা ও কর্মিকে কারারুদ্ধ করলেন। আর তাঁদেরকে খতম করার উদ্দেশ্যে বিচারের নামে প্রহসন করে সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে নিজ খেয়াল-খুশীমত অগণিত নেতা ও কর্মীকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে হত্যা করলেন।

এ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন অত্র পুস্তকের লেখক আবদুল কাদির আওদাহ। তিনি মুসলিম সমাজের জন্য বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁর লিখিত 'আত্ তাশ্রীউল জানাই ফীল ইসলাম' (ইসলামে ফৌজদারী আইন) পুস্তকখানা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক, যার প্রথম খন্ড আটশত পৃষ্ঠা সম্বলিত। দ্বিতীয় খন্ডটিও অনুরূপ। ইউরোপের বহু ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে। তিনি ১৯৫৪ সনে সাতই ডিসেম্বর শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। শাহাদতের চার বৎসর পূর্বেও তিনি একজন সুবিখ্যাত জজ, চিন্তাবিদ ও পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরূপে সারা মিসরে খ্যাতিমান ছিলেন। একজন সরকারী জজ হয়েও মিসরে প্রচলিত আইন-কানূনের সমালোচনায় তিনি মুখর থাকতেন। আর তিনি প্রায় বক্তৃতায়ই এ কথা বলে বেড়াতেন যে, মিসরের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলামী আইনের বাস্তব রূপায়ণ। এ ছাড়া বিচারকগণ স্বাভাবিকভাবে যেসব গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কর্মচরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে, তিনি ঐ সকল গর্হিত কাজ থেকে সর্বদা নিজকে মুক্ত রেখে চলতেন এবং প্রত্যেকটি মামলাকেই তিনি আদল, ইনসাফ ও সুবিচারের ফর্মুলায় ফেলে বিচার করতেন। উনিশ শত পঞ্চাশ সনে বাদশাহ ফারুক ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর যখন তাঁর ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ইখওয়ানের নেতা ও

কর্মীগণকে কারারুদ্ধ করেছিলেন তখন ইখওয়ান আদালতের শরণাপন্ন হলো। ভাগ্যচক্রে মনসূরা প্রদেশের বিচারক ছিলেন তিনিই। তাঁর কোর্টে এই মামলা দায়ের হলে তিনি শুনানীর সময় ইখওয়ানের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং তার দীনী ও রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবার সুযোগ পেলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সুবিচারের স্বার্থে ইখওয়ানের পক্ষেই রায় লিখতে বাধ্য হলেন। অতঃপর তৎকালীন বাদশাহ ফারুকের সরকার যখন এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করলো, তখন তিনি সরকারী চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজ রায়কে বহাল রাখার জন্য ইখ্‌ওয়ানের পক্ষেই ওকালতী করলেন এবং মামলায় বিজয় লাভ করে স্বীয় খ্যাতি দ্বিগুণ বেগে দেশময় ছড়িয়ে দিলেন। এরপর থেকে তিনি ইখ্‌ওয়ানে যোগদান করে নিয়মিত কর্মীরূপে দেশের ও ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। আর ইখ্‌ওয়ানও এ স্বনামধন্য মহাপুরুষকে পেয়ে তাঁর যথার্থ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে সাধারণ নায়েবে আমীর পদে সমাসীন করলো।

পাকিস্তানের 'আল-মুনীর' সাময়িকীতে ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমীনের বিশেষ সংখ্যায় আবদুল কাদির আওদাহর আলোচনায় যে মন্তব্য রাখা হয়েছিল তা এই ঃ "হিজরী সাত শতাব্দীতে ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া যেভাবে ইসলামের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনারব দর্শনের উপর দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়ে দেখিয়েছেন, তদ্রূপ এ যুগে ইসলামের সামাজিক আইনকে অনৈসলামী আইনের উপর শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত করে দেখাবার খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ।

আবদুল কাদির আওদাহ সমগ্র মিসরে একজন মুসলিম রিচার্স স্কলার হিসেবে খ্যাত ছিলেন। আর এ কারণেই ১৯৫৪ সনে যখন নাসেরের সামরিক সরকার কর্তৃক ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমীনকে বেআইনী ঘোষণা করে তার নেতা ও কর্মীবৃন্দকে কারাগারের অন্ধকার কোঠায় বন্দী করা হয়, তখন আবদুল কাদির আওদাহকে বন্দী করা হয় নি। কেননা মিসরের সর্বোচ্চ সুধীমন্ডলী ও সুশিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে তাঁকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। দ্বিতীয়ত তাঁকে শুধু একজন আইনজ্ঞ ও চিন্তাবিদই মনে করা হতো। কিন্তু আবদুল কাদির আওদাহ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীন মনোভাব পোষণ ও ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে বাধ্য হয়ে তখন জেনারেল নজীব ও কর্নেল নাসেরের মধ্যে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মতপার্থক্য পোষণ করেন। তিনি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজ হাতে নিলেন এবং দশ হাজার লোকের বিরাট এক শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিলেন। এদিকে নাসের সুযোগ পেয়ে জেনারেল নজীব ও ইখওয়ানদের ভুয়া ষড়যন্ত্রের

প্রোপাগান্ডা চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। ইখওয়ান ও নাসেরের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিরোধ যখন চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হলো, তখন নাসের সরকার ইখওয়ানকে এ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ইখওয়ানের অপরাপর নেতার সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করে কারাগারের বন্দী শিবিরে নিক্ষেপ করলেন। জেলের অভ্যন্তরে থাকাকালে ইখওয়ানের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের উপর যেভাবে পাশবিক উৎপীড়ন ও জুলুম-অত্যাচার চালানো হয়েছিল, ঠিক আবদুল কাদির আওদাহকেও অনুরূপ নির্মম জুলুমের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মর্দে মু'মিন মামলা শুনানীর সময় এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ঈমানের প্রজ্বলিত আগুনে অন্তর যখন দগ্ধ হতে থাকে এবং তার নূরানী স্নিগ্ধ পরশে অন্তর রাজ্যে যখন অসীমের প্রেমের দোলা খেলতে খেলতে সমগ্র সত্তা তার আয়ত্তাধীনে চলে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলার শান-শওকত, মহত্ব ও তাঁর মহব্বত ব্যতীত অন্তকরণে আর কোন জিনিসই বর্তমান থাকে না। সুতরাং সামরিক আদালতের সম্মুখে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ নিম্নরূপ জবানবন্দী দিয়েছিলেন ঃ

মিসর শহরকে উড়িয়ে দেবার এবং মিসর সরকারকে উৎখাত করার নিমিত্ত ডিনামাইট গোলাবারুদ, স্টেনগান ও বন্দুক সংগ্রহ করে গোপনভাবে রাখার যে কথা বলা হয়েছে তার সবকিছু কর্নেল নাসের কর্তৃক ইখওয়ানকে দেয়া হয়েছিল। ইখওয়ান এগুলো সুয়েজ খালকে ইয়াহূদীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে আমানত হিসেবে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। এ ব্যাপরে কর্নেল নাসের ভালরূপেই অবহিত ছিলেন।

তাঁদেরকে যখন ফাঁসির হুকুম শোনান হলো, তখন তাঁরা খুব খুশীতে আহ্লাদিত হয়ে স্বীয় পরওয়ারদিগারের সাথে মিলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর শোনা গেল তাঁদের মুখে সেই অন্তিম বাণী যা উচ্চারিত হয়েছিল হযরত খোবায়েব (রা)-এর পবিত্র যবানীতে।

"আমি কেন মরিতেছি এবং কোথায় মরিতেছি সে চিন্তা আমার নাই, আমি যে মু'মিনরূপে মৃত্যুবরণ করিতে পারিতেছি, সে জন্যই আমি আনন্দিত।"

এসব আল্লাহ্-প্রেমিক মহান নেতাকে যখন ফাঁসির মঞ্চে উঠানো হলো, তখন তাঁদের চেহারা খুশীতে ও শহীদী নূরের আভায় ঝলমল করছিল। আল্লাহ্র পথের এহেন শহীদানরাই নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এনেছিল সবুজের মহাসমারোহ। তাঁরা হাসতে হাসতে এ জগতকে 'আল-বিদা' জানিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু জালিমশাহী ইসলামী আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দিতে পারল কিনা, তা-ই জগত আজ নিরীক্ষণ করছে।

প্রথম খণ্ড

পরম করুণাময় মহা দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে শুরু করছি

ভূমিকা

সমগ্র প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কলম দ্বারা মানুষকে অজানা ইল্‌ম শিখিয়েছেন। আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের হিদায়তের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁকে সমগ্র মানুষের জন্য সত্য পথের আহবানকারী ও মহান শিক্ষক মনোনীত করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيَخرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের জন্য একটি নূর এবং উজ্জ্বল গ্রন্থ এসেছে। যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ গ্রন্থ্ দ্বারা শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনিই অন্ধকার থেকে তাদেরকে নিজ হুকুমে আলোয় বের করে আনেন। আর প্রদর্শন করেন তাদেরকে সরল-সহজ পথ। সূরা আল-মায়িদা ঃ ১৫-১৬

একজন মুসলমান যখন অন্যান্য মুসলমানের দিকে তাকায়, তখন তাদের করুণ অবস্থা দেখে হৃদয়ে দুঃখ, অনুশোচনা ও করুণার উদ্রেক না হয়ে পারে না। তারা ক্রমান্বয়েই দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে চলছে। এক জাহিলিয়ত হতে বের হতে না হতে আবার অন্য একটি জাহিলিয়তের অন্ধকার কূপে পড়ছে। ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকা এবং তার সাথে নিজেদের জীবন পূর্ণাঙ্গরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা থেকে বেপরোয়া হবার দরুনই যে এরূপ হচ্ছে সে বিষয়ে তারা কোনরূপ খোঁজ-খবর রাখে না। আর মানুষের মনগড়া আইন-কানূনের সাথে নিজেদের সম্পৃক্তকরণ ও তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলেই যে তারা বিনাশ হচ্ছে এবং তাদেরকে দুর্বলতার শিকারে পরিণত করছে, সে বিষয়েও তারা কোনরূপ জ্ঞান রাখে না।

আমি মনে–প্রাণে বিশ্বাস করি যে, একমাত্র ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান না রাখার ফলেই আমরা তা বর্জন করে চলেছি। আর আমাদের উলামায়ে কিরাম নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও দৈন্যের কারণে আমাদের সম্মুখে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দিতে যে অপারক হয়ে পড়েছেন, তাও শরীয়ত বর্জনের একটি অন্যতম কারণ। প্রত্যেকটি মুসলমান যদি তাদের উপর শরীয়তের আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে পারতো, তবে তা সম্পাদনের বেলায় তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতো না। বরং শরীয়তের খিদমত ও তার বিধানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতো। এজন্য আমার মতে, এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইদের শরীয়তের বিধান পরিষ্কাররূপে জানিয়ে দেওয়া এবং শরীয়তের যে দিকটি তাদের কাছে অস্পষ্ট সে দিকটিকে তাদের নিকট প্রকাশ্যরূপে তুলে ধরাই সর্বোত্তম খিদমত বলে বিবেচিত হতে পারে।

আমি আপনাদের সামনে এমন একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করছি যার ভিতর আমি সংক্ষিপ্তরূপে শরীয়তের এমন সব বিধান লিপিবদ্ধ করেছি, যেগুলো জানা একজন শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। আর এর ভিতর এমনি কতিপয় জাহিল লোকের শরীয়ত পরিপন্থী উদ্ভট দাবির থলেও খুলে দিয়েছি, যাতে পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে যে, এই দাবিগুলোর পেছনে যেমন নেই কোন যুক্তি, তেমনি নেই কোন দলীল–প্রমাণ। আমি আশা করি এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই সব বিপরীত ধারণা ও মতবাদ সংশোধন ও সংস্কার করে দিতে সক্ষম হবে, যা কতিপয় জীবন দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শী ও শিক্ষিত লোকের মানসিকতায় সৃষ্টি হয়ে আছে। আর আমি এ আশাও পোষণ করছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় 'উলামায়ে ইসলাম' ইসলামী খিদমতের বর্তমান কর্মপদ্ধতিটিকে পরিবর্তন করে আধুনিক কর্ম–পদ্ধতি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাঁরা হলেন নবী–রসূলগণের উত্তরাধিকারী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেবার উত্তম কর্মী। সুতরাং, তাদের সকলকে আল্লাহ্ তা'আলা যেন সরল–সহজ পথ প্রদর্শন করেন, এটাই তাঁর দরবারে আমার প্রার্থনা।

— গ্রন্থকার

মুসলমানের জন্য অপরিহার্য ইলম

আমরা মুসলমান এবং বিজাতিরা যে আমাদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত 'মুসলিম' নামে সম্বোধন করে সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবেই খুশি ও গৌরবান্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় তো দূরের কথা, তার গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো সম্পর্কেও কোন জ্ঞান রাখি না এবং তার প্রাথমিক মহান ভিত্তিমূলগুলো সম্পর্কেও সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও নির্ভীক হয়ে পড়েছি।

শরীয়তী বিধান ও তার মূল ভিত্তি

ইসলামী বিধান বলতে সেইসকল মৌলিক দর্শন ও বিধিমালার কথাই বোঝায়, আল-কুরআন যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত নবী করীম (স) যা আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন। এ মৌলিক দর্শন ও নীতিমালাকেই আমরা 'ইসলামী শরীয়ত' নামে অভিহিত করে থাকি। এদিক দিয়ে শরীয়ত সেই সকল মৌলিক দর্শন ও নীতিমালার সংকলন বিশেষ, যাকে ইসলাম তাওহীদ, ঈমান, ইবাদত, ব্যক্তিগত অবস্থা, অপরাধ, সামাজিক আচরণ, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি—এক কথায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে।

ইসলামের ভিত্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো তার বিধান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। কেননা ইসলামী বিধানের দাওয়াত, তা'লীম ও এর প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইসলামের কল্পনাই করা যায় না।

এমনিভাবে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নির্ভীক ও বেপরোয়া আচরণ প্রদর্শন করা বা তাকে অকর্মণ্য করে দেওয়ার দ্বারা ইসলামের সাথে যে অমনোযোগিতামূলক ব্যবহার দেখান হয় পক্ষান্তরে এতে তাকে কর্মহীন করে দেওয়া হয়, তা উপলব্ধি করতে কারো কষ্ট হয় না, অতি সহজেই প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

শরীয়তী বিধান ইহকাল-পরকাল ব্যাপী

ইসলামী বিধান দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের বিধান দ্বারা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে শামিল রয়েছে ঈমান, আকীদা ও ইবাদতের বিধানসমূহ। আর দ্বিতীয় ধরনের বিধানে রয়েছে রাষ্ট্রের এবং জামা'আতের সংগঠনী কাজ। আর ব্যক্তি এবং জামা'আতের পারস্পরিক সম্পর্কও এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ভিতর শামিল রয়েছে লেন-দেন ও আদান-প্রদানের নীতিমালা, দণ্ডবিধান, ব্যক্তিগত অবস্থা, শাসনতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানূন। এমনিভাবে ইসলাম মসজিদ, গির্জা, ইবদাত ও নেতৃত্ব সবকিছু স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে তার ভিতরে একাকার করে দীন-দুনিয়া ও ইহকাল-পরকালের পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে থাকে। ধর্মীয় বিধান যেরূপ ইসলামের অপরিহার্য অংশ, অনুরূপ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীও তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই হযরত উসমান (রা) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন ঃ

ان الله ليزع بالسلطان ما لايزع بالقران

আল্লাহ তা'আলা রাজক্ষমতা দ্বারা সেই দুর্নীতি ও অনাচারকে দূরীভূত করে থাকেন যেই দুর্নীতি ও অনাচার কুরআন দূরীভূত করতে পারে না।

ইসলামের মধ্যে অসংখ্য সাংবিধানিক শাখা-প্রশাখা থাকা সত্ত্বেও তা এর দ্বারা পরকালে মানুষের মুক্তি ও সাফল্য দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই বহন করে। এ কথাই বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি পার্থিব কাজের একটি পারলৌকিক দিক রয়েছে। সুতরাং কোন ইবাদতী কাজ, যেমন নামায,রোযা বা কোন পার্থিব কাজ, যেমন শাসনতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ ইত্যাদি কর্তব্য সম্পাদনের দিক দিয়ে অথবা বিষয়টির মূল কর্তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক দিয়ে, কাহারো অধিকার ও হক ফিরিয়ে দেওয়া বা তা হরণ করার দিক দিয়ে কিংবা কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বা জবাবদিহিকরণ সম্পর্কিত বিধিমালার ক্ষেত্রে তার একটি নিজস্ব প্রভাব পার্থিব জগতে বিস্তার লাভ করে থাকে। কিন্তু ঐ একই কাজ যার প্রভাব এ পার্থিব জগতে বিস্তার লাভ করে তার অন্য একটি প্রভাব ও পরিণতি সৃষ্টি হয়ে থাকে পরকালীন জীবনের জন্য—যাকে আমরা পরকলে আযাব ও শাস্তি এবং সওয়াব ও কল্যাণ নামে অভিহিত করে থাকি।

দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের মুক্তি ও সাফল্য আনয়নই যখন ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন এমন একটি একক বিষয় যা আদৌ বিভাজ্য হয় না, তা

একটি অবিচ্ছিন্ন শিকল বিশেষ। সুতরাং এর একটি অংশকে গ্রহণ করা এবং দ্বিতীয় অংশটিকে পরিত্যাগ করা তার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার নামান্তর। কোন লোক আল-কুরআনের আয়াত এবং তার বিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, তার বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটি কমন নেয়া শাস্তি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। একটি শাস্তি হলো এ পার্থিব জগতে আর অপর শাস্তিটি হলো পরকালীন জগতে। যেমন আল-কুরআন ডাকাতির অপরাধের জন্য পার্থিব জগতে হত্যাকরণ বা হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা শূলদণ্ডে চড়ান বা দেশান্তরিত করে দেওয়ার শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনি পরকালের জন্য নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছে কঠোর শাস্তি। কুরআন বলে ঃ

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

> যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পার্থিব জগতে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে থাকে, তাদের জন্য এ পার্থিব জগতে শাস্তি হলো হত্যা করে ফেলা ব শূলদণ্ড দেওয়া অথবা তাদের হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা তাদেরকে দেশান্তরিত করে দেওয়া আর এ ছাড়া এ পার্থিব জগতে যেমন তাদের জন্য রয়েছে অপমান-লাঞ্ছনা, তেমনি রয়েছে পারলৌকিক জীবনে কঠোর শাস্তি। —সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩৩

এমনিভাবে নির্লজ্জ ও অশ্লীলতার প্রসার ও প্রচলন এবং সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করার অপরাধে একটি শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এ পার্থিব জগতে। আর পরকালের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে এক প্রকার শাস্তি। সুতরাং এ ব্যাপারে আল-কুরআনের ভাষা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

যারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জের প্রসার কামনা করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য এ পার্থিব জগতে ও পরকালে কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। -সূরা আন-নূর ঃ ১৯

এ বিষয়ে আল-কুরআনের অপর এক স্থানে বিবৃতি নিম্নরূপঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

যারা পবিত্র সতী-সাধ্বী ও সরলমনা মু'মিন নারীদের প্রতি ব্যভিচারের দোষ চাপায়, দুনিয়া ও আখিরাতে তারা অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যে দিন তাদের মুখ ও হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষী দেবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। সেই সময়ই তারা সম্যক অবগত হতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রকাশ্য সঠিক বিচারক ও সত্য। -সূরা আন-নূর ঃ ২৩-২৫

এ ছাড়া ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ক্ষেত্রেও আল-কুরআন এ দুনিয়ায় প্রতিশোধ এবং পরকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যেমন আল- কুরআনে বিবৃত হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য এ পার্থিব জগতে হত্যার অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে।

—সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৮

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا

যদি কেউ কোন মু'মিন নর-নারীকে ইচ্ছা করে হত্যা করে, তবে পরকালে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে চিরদিন থাকবে। —সূরা নিসা ঃ ৯৩

অবশ্য কঠোরতার দিক দিয়ে আল-কুরআনে আমরা এমন বিধানও পেয়ে থাকি, যা ইসলামী শরীয়তে পার্থিব শাস্তিকে পরিহার করে পারকালীন শাস্তির প্রতি কঠোরভাবে জোর দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ ۝ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

মু'মিন ব্যক্তিরা কি কখনো ফাসিকদের মত হতে পারে ? এরা উভয়ে কখনোই সমান নায়। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার হলো চিরন্তন জান্নাত। আর যারা নাফরমানী করে তাদের স্থান হলো জাহান্নাম। ঐ জাহান্নাম হতে যদি কখনো তারা বের হতে চায়, তবে তাদের তার মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবেঃ তোমরা সেই আগুনের শাস্তি উপভোগ করতে থাকো, যে শাস্তির কথা তোমরা পার্থিব জগতে থাকাকালে মিথ্যা মনে করতে। -সূরা আস-সাজদা ঃ ১৮-২০

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, তাদের তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। এ জান্নাত হবে তাদের জন্য চিরন্তন বাসস্থান, সর্বদাই সেখানে তারা বসবাস করবে। আর যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে চলবে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে, তাদের জাহান্নামে প্রবিষ্ট করানো হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে সেখানে তারা বসবাস করবে। আর সেখানে হবে তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি। -সূরা আন-নিসা ঃ ১৩-১৪

ইসলামী শরীয়তের বিধান এ পার্থিব জগত ও পরকালের জন্য অনর্থক রচনা করা হয়নি। বরং স্বয়ং শরীয়তের ভাষ্যকারই এর যথার্থ দাবি উত্থাপন করে থাকে। শরীয়তী বিধান এ দর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, এ পার্থিব জগত হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান ও নশ্বর জগত। আর পরকাল হচ্ছে অবিনশ্বর ও প্রতিদান লাভের স্থান। মানুষ এ পার্থিব জগতে স্বীয় কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করবে এবং পরকালে হবে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত। যদি তারা এ পার্থিব জগতে থাকাকালে ভাল কাজ করে, তবে মনে করতে হবে যে, সে নিজেরই কল্যাণ করছে। আর যে খারাপ কাজ করবে, সে নিজের জন্যই অকল্যাণ ডেকে আনছে। এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্থিব শাস্তি পরকালীন শাস্তিকে রুখে রাখতে বা মিটিয়ে ফেলতে পারে না—যে তা আপন হতেই দূর হয়ে যাবে। তবে যারা খাঁটি মনে নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করবে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন।

ইসলামী শরীয়ত মানব রচিত আইন-কানূন হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা এর দ্বারা ইহকাল-পরকাল এবং দীন-দুনিয়ার পার্থক্যকে মিটিয়ে উভয়কে একাকার করে ফেলা হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যই তা প্রদান করা হয়েছে। আর শরীয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, বিপদে-আপদে—এক কথায় সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করার জন্য যে উৎসাহিত করা হয়েছে তা কেবল এ জন্যই। কেননা তারা এর প্রতি ঈমান রেখে থাকে এবং শরীয়তী বিধানের অনুশাসনও মেনে চলে। আর তারা অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছে যে, এর আনুগত্য করাও এক ধরনের 'ইবাদত, যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্য দান করবেন। আর আল্লাহ্‌র আইনের পায়রবীর পরিণামে উত্তম প্রতিদানও পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে যদি কোন লোক দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কাজ করার সুযোগ পায় এবং পার্থিব শাস্তি হতে রেহাই পাবার পথও যদি তার সম্মুখে খুলে যায়, তথাপিও সে এ পথ গ্রহণ করবে না। কেননা পরকালীন শাস্তির কথা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার গযবের প্রতিচ্ছবি তার চক্ষের সামনে তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

এ সকল বিষয় এ কথাই দাবি করে যে, উল্লিখিত দর্শন ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তির উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি ও দুরাচার

খুব কমই দেখা যাবে। আর সেখানে থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং সামাজিক শাসন-শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনার তদারকী। আর এর পরিপন্থী মানব জ্ঞানপ্রসূত আইন-কানূন এবং তাদের মনগড়া শাসনতান্ত্রিক বিধানাবলীর কি করুণ দৃশ্য ফুটে ওঠে তাই লক্ষ্য করুন। যেসব লোকের উপর এ মানবিক জ্ঞানপ্রসূত আইন-কানূন প্রয়োগ করা হয়, তাদের অভ্যন্তরীণ জগতে এমন কোন চেতনা পাওয়া যায় না, যাতে করে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদেরকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তার অনুকরণের জন্য উৎসাহিত করতে পারে। তারা শুধু এ আইন-কানূনের প্রতি এতটুকু পরিমাণই শ্রদ্ধাশীল ও অনুকরণপ্রিয় হয়, যতটুকু বাহ্যিকরূপে তার পাকড়াওর আশংকা বিদ্যমান থাকে। আর যদি কোন লোক কোন প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী হয় ও তা করার সুযোগ পায় এবং আইনের হস্তক্ষেপেরও যদি কোনরূপ আশংকা না দেখতে পায়, তখন তাকে এহেন দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কাজ হতে বিরত রাখার এ সব আইন রচনাকারীদের নিকট যেমন নেই কোন নৈতিক বিধিমালা, তেমনি নেই কোন কর্মপদ্ধতি। এ কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ সকল দেশে অধিক অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হচ্ছে এবং দিন দিন তার সংখ্যা বেড়েই চলছে। সেখানে আইনের প্রয়োগ খুব বেশি পরিমাণে হয় বটে কিন্তু চরিত্র শক্তি ক্রমে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে, আর অপরাধীদের সংখ্যা আধুনিকতাবাদী বা প্রগতিপন্থী শিক্ষিত লোকের মধ্যে বেড়েই চলে। কেননা এ শ্রেণীর লোকেরা নিজের আইনের হস্তক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করে দিয়েছে।

শরীয়তী বিধান অবিভাজ্য

শরীয়তী বিধান সর্বদাই অবিভাজ্য। এর কিছু অনুসরণ এবং কিছু পরিত্যাগ নিষিদ্ধ। এমনিভাবে এর কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করাও নিষিদ্ধ। এ দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলী যেমন অনুসরণীয়, তেমনি শরীয়তী বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। সুতরাং যারা শরীয়তের সমুদয় বিধানের প্রতি ঈমান না আনবে এবং তাকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত না করবে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোপানলে পড়বে। যেমন কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَل

ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আন আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর ? তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ প্রদর্শন করবে তাদের এ ছাড়া আর কিছুই নাই যে, তারা এ পার্থিব জগতে হবে অপমানিত আর পরকালে নিক্ষিপ্ত হবে কঠোর শাস্তির মধ্যে। —সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৫

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

যারা আমার সেসব অবতীর্ণ দলীল ও হিদায়ত গোপন করে থাকে যা আমি মানুষের জন্য কিতাবে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেছি তাদের প্রতি যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন, তেমনি অন্যান্য অভিশাপ দানকারীও অভিশাপ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যারা খালিসভাবে তওবা করবে এবং সংশোধন হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও হিদায়ত পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করে দেবে,এমন লোকদের তওবা আমি কবূল করবো। আমিই অধিক তওবা কবূলকারী ও দয়ালু। -সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৯-১৬০

উল্লিখিত আয়াতে গোপন করার অর্থ হলো কতিপয় বিধান বাস্তবে রূপায়িত এবং কতিপয় বিধান পরিত্যাগ। আর কতিপয় বিধানের স্বীকৃতির সাথে কতিপয় বিধানকে অস্বীকার করা; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা গোপনী করার ভয়াবহ পরিণামের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

যারা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে অবতীর্ণ বিষয়গুলো গোপন করে রাখে এবং তার বিনিময়ে খুব নগণ্য মূল্যই গ্রহণ করে থাকে ,তারা আগুন দ্বারা নিজেদের উদরপূর্তি ছাড়া আর কিছুই করছে না। কিয়ামতের দিন যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তেমনি তাদের গুনাহ হতে পবিত্রও করবেন না। এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। যারা হিদায়তের বিনিময়ে গুমরাহীকে এবং মাগফিরাতের বিনিময়ে আযাবকে খরিদ করে নিয়েছে তারা দোযখের আযাবের বেলায় কতই না বেশি ধৈর্যশীল ! —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৪-১৭৫

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۰ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর। আর আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। যারা আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ বিধানমাফিক মিমাংসা করে না, তারা কাফির। —সূরা মায়িদা ঃ ৪৪

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُوْلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا

যারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, আর আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলে থাকে যে, আমরা কতক মানি আর কতক মানি না, আর তারা এর মাঝে একটিকে বেছে নিতে চায়,তারাই হচ্ছে সত্যিকার কাফির।

—সূরা আন-নিসা ঃ ১৫০-১৫১

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَائَكَ مِنَ

الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۚ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

হে মুহাম্মদ! আমি এ কিতাবকে আপনার কাছে সত্যরূপে এবং হিদায়তের ভান্ডাররূপে নাযিল করেছি–যা আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ববর্তী অন্যান্য অবতীর্ণ কিতাবসমূহেরও স্বীকৃতি ঘোষণা দিয়ে থাকে এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিও রেখে থাকে। সুতরাং এখন আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিধানের আলোকে মীমাংসা করুন, আর আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তা থেকে বিমুখ হয়ে ওদের ইচ্ছার অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি এক একটি নিয়ম-নীতি বেধে দিয়েছি। ওদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান- মাফিক বিচার-ফয়সালা করুন এবং ওদের ইচ্ছার অনুসরণ করবেন না। আর আপনার নিকট আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কতিপয় বিধান হতে যেন আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে, সে ব্যাপারে ওদেরকে ভয় করুন। ওরা যদি (আল্লাহ তা'আলার এহেন হিদায়ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) এ থেকে ফিরে থাকে, তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা ওদের কতিপয় গুনাহের জন্য ওদেরকে শাস্তি দেবেন। মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহে বহু লোকই ফাসিকীর মধ্যে নিপতিত রয়েছে। এরা কি জাহিলিয়তের মীমাংসা চায় ? ঈমানদার- গণের জন্য আল্লাহ তা'আলার মীমাংসার চেয়ে অন্য কারো মীমাংসা উত্তম হতে পারে কি ?

–সূরা মায়িদা ঃ ৪৮-৫০

ইসলামী শরীয়ত বিশ্বজনীন

ইসলামী শরীয়ত বিশ্বজনীন হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা একে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এজন্য নাযিল করেছেন যে, তিনি আরব-অনারবের মানুষের নিকট, প্রাচ্য ও পাশ্চাতের বিভিন্ন মতবাদীর নিকট একে পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেবেন। সুতরাং এ শরীয়ত প্রত্যেকটি গোত্র, সম্প্রদায় ও সেই সকল সমাজের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান—সমাজ চিন্তাবিদগণ যার স্বপ্ন নিজেদের ধারণা মতে পর্দার অন্তরালে দেখে থাকেন। কিন্তু এখনো তাকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করতে সক্ষম হননি। পবিত্র কালামে মজীদের এ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(হে মুহাম্মদ) আপনি ঘোষণা করে দিন যে, হে মানুষেরা! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল মনোনীত হয়ে প্রেরিত হয়েছি।

—সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৮

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে হিদায়ত ও সত্য দীনসহ এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, তিনি একে সমস্ত বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখাবেন। —(সূরা ফাত্‌হ ঃ ২৮)

ইসলামী শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন

নিঃসন্দেহে এ শরীয়ত আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে পূর্ণাঙ্গ। জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধানরূপে একে অবতীর্ণ করা হয়েছে। একে পূর্ণত্ব লাভ করতে একটি যুগ অতিবাহিত করতে হয়েছে। এর সূচনা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সূচনাকাল হতে আরম্ভ হয়ে তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সময় নিয়ে পূর্ণত্ব লাভ করেছে অথবা তাঁকে তখনই পূর্ণত্ব দান করা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম। আর মনোনীত করলাম আমি তোমাদের জন্য জীবন-বিধান হিসাবে দীন-ইসলাম। —সূরা মায়িদা ঃ ৩

আল-কুরআনের এ ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামী শরীয়ত জীবন-বিধান হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে একমাত্র শেষ নবী, তাঁর পর অন্য কোন নবীর আগমন হবে না, তা-ও তাঁর উপস্থিত জীবন-বিধান পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন হওয়ার আর একটি দলীল বিশেষ। তাই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

হযরত মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। —সূরা আল-আহযাব ঃ ৪০

শরীয়তী বিধানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থা, আচরণ ও রাজনৈতিক বিষয়সহ সকল বিষয় সম্বলিত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান! তা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে থাকে, তেমনি আলোচনা করে থাকে সামাজিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কথা নিয়ে। তা যুদ্ধ ও সন্ধি অবস্থায়ও এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে সংগঠিত করে থাকে।

ইসলামী জীবন-বিধান কোন বিশেষ সময়ের জন্য আসেনি। কোন বিশেষ যুগের সাথেও তা সংশ্লিষ্ট নয়। তার আঁচলবিশেষ কোন সময়, যুগ ও দেশের সাথে বাঁধা নয়। এ একটি শাশ্বত জীবন-বিধান।

শরীয়তী জীবন-বিধান এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে, এর উপর যুগের আবর্তন-বিবর্তনের কোন প্রভাব পড়ে না। আর যুগের আবর্তন ও নিত্য-নতুন রঙ

গ্রহণ দ্বারাও এর সজীবতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। এর সাধারণ নীতিমালা ও মৌলিক দর্শনসমূহ বিবর্তনের দাবিই স্বীকার করে না। কেননা এ বিধান এবং তার ঘোষণাবলী স্বীয় সাধারণত্ব রূপায়ণের দিক দিয়ে এমন বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, প্রত্যেকটির নতুন অবস্থায়ই তার প্রয়োগ সম্ভবপর।

এ কারণেই ইসলামী বিধান ও তার ঘোষণাবলী অন্যান্য মানব রচিত আইন-কানূন ও শাসন প্রণালীর ন্যায় কোনরূপ আবর্তন-বিবর্তন গ্রহণ করে না।

শরীয়তী আইনের সূচনা ও মানব রচিত আইনের সূচনার তুলনা

শরীয়তী বিধানের সূচনা কিরূপে হয়েছে তা আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে। এখন আমরা মানব জ্ঞানপ্রসূত আইন-কানূনের কথা বলতে প্রয়াস পাবো। মানব রচিত আইন এমন এক দল বা সমাজের হাতে তৈরি হয়ে থাকে, যে সমাজ বা দল এর রূপরেখা অঙ্কিত করে সীমিত ভিত্তির উপর তার সূচনা করে থাকে। অতঃপর এ দল বা সমাজ যতই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে থাকে তাদের আইন-কানূনও সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যখন আধিক্য ও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় এবং সমাজ স্বীয় চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন আইনের নীতিমালাও ততই বেশি হতে থাকে এবং তার দর্শনসমূহেরও বিভিন্ন রূপরেখা গ্রহণ করতে থাকে।

আইনের নীতিমালা সমাজের সমসাময়িক প্রভাবশালী লোকদের দ্বারাই লিপিবদ্ধ হয়। আর তারা নীতিমালা ও কর্ম প্রণালীকে সমধিক যথার্থ ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দায়িত্বশীলও থাকে বটে। আর সময়ের তাগিদে একে পরিবর্তন, সংস্কার ও সংশোধন করতে হলে মূলত তা দল বা সমাজ দ্বারাই হয়।

আর এমনিভাবে নিজেদের প্রয়োজন আইনের দ্বারা পূরণ হওয়ারও যথাবিহিত ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করে। অর্থাৎ আইনই আসলে সমাজের প্রয়োজনের অনুবর্তী ও বশবর্তী হয়। সমাজ নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সোপানসমূহ অতিক্রম না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন উন্নতির সোপানসমূহ অতিক্রম করতে পারে না। যেমন আইনবিদরা বলছেন যে, আইনের সূচনা ও রূপায়ণ ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে বংশের পত্তন ও প্রতিষ্ঠার সাথেই কার্যকর হয়েছে। অতঃপর তা গোষ্ঠী ও গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে

ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্ররূপী সংস্থাটি প্রকাশের সাথে তার পরিবর্তনও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত সূচনাকাল আরম্ভ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও নবতর সামাজিক দর্শনের আলোকে। এমনিভাবে মানব রচিত আইনসমূহকে প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিরাট বিরাট কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হয়েছে। আর বর্তমানে এটা দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার অস্তিত্ব পূর্ববর্তী যুগের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইসলামী বিধানের গতি-প্রকৃতি মানব রচিত আইনের গতি-প্রকৃতি হতে পৃথক

আইনের সূচনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা কিছু বক্তব্য পেশ করা হলো তার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, শরীয়তী বিধান মানব রচিত আইন-কানূনের সাথে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য রাখে না। শরীয়তী বিধান মানব রচিত আইনের সাথে কিছুমাত্র সাদৃশ্য রাখলে তবে তা যেই অবস্থায় ও রূপরেখায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেই অবস্থায় অবতীর্ণ হতো না। বরং তখন তার জন্য প্রয়োজন প্রথমত একটি সংবিধান অবতীর্ণ করা, অতঃপর তা মানব রচিত আইনের ন্যায় সামাজিক জীবনের বিভিন্ন আবর্তন-বিবর্তন ও বিপ্লবের সাথে উন্নতির সোপানগুলো অতিক্রম করা অপরিহার্য হতো। এমনিভাবে শরীয়তী বিধানের নিকট সেই নবতর আইনের দর্শনগুলো বর্তমান থাকার সম্ভাবনা হয়তবা কোথায় লুকিয়ে থাকত, যার সন্ধানজ্ঞান আইন বহু যুগ পরে বর্তমানে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবিকই যদি শরীয়তী বিধান ও মানব রচিত আইনের গতি-প্রকৃতি একইরূপ হতো তবে শরীয়তী বিধান ও মানব রচিত আইনের ন্যায় হাজার হাজার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার পর এ মনযিলে গিয়ে উপনীত হতো। কিন্তু আসল বিষয়টা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের মৌলিক পার্থক্য

ইসলামী শরীয়ত ও মনব রচিত আইনের মধ্যে তিনটি দিক দিয়ে মৌলিক পার্থক্য ও মতবিরোধ বিদ্যমান।

১. শরীয়তী বিধান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিধান। আর অপরদিকে আইন হচ্ছে এর বিপরীত মানবিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিধান। শরীয়ত ও মানব

রচিত আইন উভয়ই আপন আপন সত্তায় সমুজ্জ্বল। যেহেতু মনব রচিত আইন হচ্ছে মানবিক জ্ঞানের উৎপাদন, সেহেতু সে নিজের মধ্যে মানবিক অপূর্ণতা, অপারগতা ও মুখাপেক্ষিতা এবং অদূরদর্শিতাকে ধারণ করে বলেই তাকে বারংবার বিবর্তন ও সংস্কার-সংশোধনের শিকারে পরিণত হতে হয়। আপনি তার নাম প্রগতি বা অগ্রগতি যা-ই রাখেন না কেন, কোন মানব সমাজ যখন এমন স্তরে গিয়ে উপনীত হয়, ইতিপূর্বে যার কোন আশা পোষণ করা হতো না অথবা এর অবস্থার মধ্যে এমন বিরাট আকারের বিবর্তন দেখা দেয়, যার ধারণা ও চিন্তা ইতিপূর্বে মনেও আসেনি, তখন আইনের ক্ষেত্রে সংস্কার ও সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এমনিভাবে মানব রচিত আইন-কানূন সর্বক্ষণ অপূর্ণই থাকে এবং তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতার সীমারেখায় গিয়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রণেতারা পূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত না হয়। আর এমন হওয়া যে আদপেই সম্ভব নয় তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কেননা মানুষ কেবল অতীতকেই জানতে পারে এবং অতীতের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারে, ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান রাখা এবং ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা তার দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। এটা তার ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে শরীয়তের প্রণেতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এর সৃষ্টিগত ক্ষমতা, এর পূর্ণত্ব ও মহত্ত্ব এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানের পরিধি, সবকিছু তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করে থাকেন। আর মৌখিক ভাষা ও বাস্তবতার ভাষা উভয়ের দ্বারাই তিনি তাঁর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। সুতরাং শরীয়তী বিধান সেই মহাজ্ঞানী ও মহাসাংবাদিকই রচনা করেছেন, যিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল।

২. দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে মানব রচিত আইন দ্বারা সেই সমসাময়িক নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতিকে বোঝান হয়, যাকে একটি সমাজ নিজেদের জীবনের পারস্পরিক লেন-দেন, আদান-প্রদান ও ব্যবহারিক দিকটির সংগঠন এবং নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য রচনা করে। এ দিক দিয়ে সে এমনই দর্শন যা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই স্বীয় কর্মময় ভূমিকা পালন করে। অথবা আজ হয়তো সে সমাজের সাথেই থাকছে, কিন্তু আগামীতে আর তাকে সমাজের সাথে থাকতে দেখা যায় না। কেননা মানব রচিত আইন সমাজের সাথে

দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হয় না। বরং তা এমনই সমসাময়িক নীতিতে পরিণত হয়, যা সমাজের সমসাময়িক অবস্থার সাথে যদিও বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, কিন্তু যখনই সমাজের অবস্থা পাল্টে যায়, তখনই তার মধ্যে বিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু শরীয়তের বিধান আল্লাহ তা'আলা চিরদিনের জন্যই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন তার আলোকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয় সংগঠিত হয়। আমরা শরীয়তী বিধান ও মানব রচিত আইন-কানূনের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আর তা হচ্ছে এরা উভয়ই সামাজিক জীবনের সংগঠনকেই নিজেদের সম্মুখে উদ্দেশ্যরূপে রেখে দিয়েছে। কিন্তু শরীয়তী বিধান তার নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি চিরন্তন হওয়া এবং কোনরূপ সংস্কার-সংশোধনকে প্রশ্রয় না দেওয়ার অর্থের দিক দিয়ে মানব রচিত আইন–কানূন হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ বৈশিষ্ট্যময় গুণটি, যা শরীয়ত বিধানকে মানব রচিত আইন থেকে পৃথক করে থাকে, তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমত শরীয়তী বিধানের মৌলিক নীতিমালা এবং তার ঘোষণা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তার এতটুকু সাধারণত্ব সার্বজনীন থাকবে, যুগ যতই প্রগতির দিকে অগ্রসর হোক না কেন এবং মানবিক সমস্যা ও প্রয়োজন যতই প্রকট ও জটিল হোক না কেন, সে সমাজের অভাব ও প্রয়োজনকে পূরণ করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয়ত শরীয়তী বিধানের মৌলিক নীতিমালা এবং তার ঘোষণাবলী এমন মহান ও উন্নত হবে, যা কোন সময় ও কোন যুগেই সমাজের প্রগতিশীল দাবি ও আকাঙক্ষাকে পূরণ করতে অপারগ হবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞান ও যুক্তি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধানের জন্য যেই গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলির দাবিদার নয়, তা পূর্ণরূপে উভয় অবস্থায়ই শরীয়তী বিধানের মধ্যে বর্তমান। শুধু তাই নয়, বরং এগুলো হচ্ছে শরীয়তী বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শরীয়তী বিধানের ঘোষণাবলী বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়ণের যোগ্যতার দিক দিয়ে স্বীয় পূর্ণত্বের সীমারেখা পর্যন্ত এমন বিস্তৃত, যেমন সে স্বীয় মহত্ত্ব ও উন্নতির ক্ষেত্রে সীমাহীন, যার চেয়ে অধিক উন্নত ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়।

এই শরীয়তী বিধানের উপর থেকে তের শতাব্দীর অধিককাল সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যেমনি মানুষের জীবন পদ্ধতির ধারা পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি তাদের চিন্তাধারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও

সাধিত হয়েছে মহাবিপ্লব। উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের এমন বিস্ময়কর বস্তু দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, যা মানুষের ধারণা জগতের কোথাও কখনো উদিত হতো না। আর নবতর অবস্থা ও পাত্রের অনুকূলে দেশ ও সমাজকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য মানব রচিত আইন-কানূন ও তার ঘোষণাবলীকে পরিবর্তন করা হয়েছে কয়েকবার। এমনিভাবে বর্তমান যুগে মানব জীবনের উপর রচিত আইন-কানূনের যে নীতিমালাগুলোকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, আর শরীয়তী বিধান অবতীর্ণের সময় যেই সব নীতিমালা সমাজের উপর প্রয়োগ করা হতো, এদের মধ্যে আমরা আসমান-যমীনের ব্যবধান ও পার্থক্য বর্তমান দেখছি। কিন্তু এতসব বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে ইসলামী শরীয়তকে আমরা তার স্থানে অনড়ই দেখছি। যেমন কোন বিবর্তন তা গ্রহণ করেনি তেমনি গ্রহণ করেনি কোন সংস্কার ও সংশোধনকে। তার মৌলিক নীতিমালা ও ঘোষণাবলীর মধ্যে এখনও মানব সমাজের সংগঠন এবং তার অভাব, প্রয়োজন পূরণ ও উন্নতির পূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান। বর্তমানে সে তাদের স্বভাব-প্রকৃতির ততখানিই নিকটবর্তী, যতখানি সে প্রথমে ছিল তাদের শান্তি নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় হিফাযতকারীরূপে।

ইসলামী শরীয়তের পক্ষে ইহা একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। এর পক্ষে শুধু এ একটি প্রমাণই নয় বরং আরও অধিক বিস্ময়কর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণাবলী এবং তার অভ্যন্তরীণ যুক্তিসমূহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ-

বিভিন্ন কাজকর্মের বেলায় তাদের সাথে পরামর্শ করে নাও।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯

وَ أَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ-

এদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।

—সূরা আশ-শুরা ঃ ৩৮

অথবা আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণাটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ-

সৎ ও আল্লাহ্-ভীরুতার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো, আর পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকো।

—সূরা আল-মায়িদা ঃ ২

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা ঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ-

ইসলামে যেমন অপরের ক্ষতি সাধন করার বৈধতার অবকাশ নেই, তেমনি সে এ কথাও বলে না যে মানুষ নিজের ক্ষতি নিজেরা করুক!

বস্তুত কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে এ ধরনের বহু ঘোষণাই বর্তমান রয়েছে, যা স্বীয় সার্বজনীনতা ও বাস্তব রূপায়ণের দিক দিয়ে পূর্ণতার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত। অর্থাৎ 'শুরার' প্রতিষ্ঠা এমন একটি মৌলিক নীতি, যার আলোকে একদিকে যেমন গুনাহ ও অনিষ্টের দরজা বন্ধ হয়, অপরদিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয় সৎ ও আল্লাহ্-ভীরুতার কাজে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি। এমনিভাবে শরীয়ত স্বীয় মহত্ত্ব ও উন্নতিকে এমন আসনে সমাসীন করছে যেখানে মানবিক মানদণ্ড পৌঁছতে অক্ষম।

৩. ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সংগঠন এবং তার বিভিন্ন দিকের পুনর্গঠন। এর দ্বারা সে সর্বদা সমাজে সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান লোক সৃষ্টি করতে চায় । তার চোখের সামনে এ জগতে একটি ছায়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং একটি ছায়া জগতের সৃষ্টিই বর্তমান থাকে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার ঘোষণাবলী ততখানি উন্নতমানের হয়েছে, যা তার অবতীর্ণকালীন সময়ের সমগ্র দুনিয়ার মনদন্ডের তুলনায় অধিক উন্নত ও অধিক বুলন্দমানের বলে প্রতীয়মান। আর বর্তমানেও ঠিক তদ্রূপই উন্নতমানের রয়েছে। সে এমন মূলনীতি ও দর্শন নিয়ে এসেছে,যার সাথে ইসলামী জগৎ ব্যতীত অন্য কোন দেশ সঠিকরূপে পরিচয় লাভ করতে পারেনি, আর এখন পর্যন্তও সমর্থ হয়নি জগৎ তার মনযিলগুলোকে চিনে নিতে। আজকের দুনিয়া শত শত বছর পরেও এর নিকটবর্তী পরিদৃষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু সেখানে পূর্ণরূপে পৌঁছতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শরীয়তকে রচনা করার এবং অবতীর্ণ করার বেলায় নিজেই যত্নবান ছিলেন। তিনি এটাকে এ জগতে একটি পূর্ণাঙ্গ নমুনারূপে এজন্য

অবতীর্ণ করেছেন, যেন মানুষকে আনুগত্য ও মহত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে তাদেরকে অধিক হতে অধিকতর সৎ ও সভ্য বানিয়ে দিতে পারে এবং পরিশেষে তারা যেন শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ডটির নিকটবর্তী হয়ে যেতে পারে। মানব রচিত আইনের ক্ষেত্রে নীতিগত কথা হচ্ছে যে, তা দল ও সমাজের ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠন করে না। সমাজ গঠন হবার পরে আইন তার কর্মময় ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাখ্যা ও বিবর্তন উপস্থিত করে। কিন্তু আইনে এহেন মৌলিক দর্শনটি বর্তমান যুগে পাল্টে গেছে। তাই বর্তমানে আইন সমাজের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস উভয় কাজের জন্য নিজেকে দায়িত্বশীল ভেবে থাকে। সুতরাং আধুনিক বস্তুবাদী আন্দোলনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলো জনসাধারণকে আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করে নতুনরূপে পুনর্গঠিতকরণ এবং তাদেরকে একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর অনুগত বানানোর জন্য আইনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। যেমন রাশিয়া, তুরস্ক, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশ। এমনিভাবে মানব রচিত আইন বর্তমানে হয়ত সেই স্থানে উপনীত হবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যেখান থেকে ইসলামী শরীয়ত তার চলার পথের সূচনা করেছিল।

শরীয়তী বিধান ও প্রচলিত আইনের প্রকৃতিগত পার্থক্য

ইসলামী শরীয়ত তিনটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে মানব রচিত আইন হতে স্বতন্ত্র।

১. পূর্ণতা ঃ মানব রচিত আইনের মুকাবিলায় শরীয়তী বিধান পূর্ণাঙ্গ। কেননা মূলনীতি ও দর্শনের দিক দিয়ে শরীয়তী বিধান সেই সকল অভাবকে পূরণ করে, যার জন্য মানুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। হোক্ সে মানুষ বর্তমান যুগের বা ভাবীকালের।

২. মহত্ত্ব ঃ শরীয়তী বিধানের দ্বিতীয় পার্থক্যজনিত গুণটি হলো তার আদর্শগত মহত্ত্ব। অর্থাৎ শরীয়তী বিধান সর্বদাই আদর্শ হিসেবে সামাজিক ও সাধারণ মানদণ্ডের তুলনায় এতখানি মহত্ত্ব ও উন্নতমান ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে যে, যখনই কোন জামা'আত বা সমাজের আদর্শিক মানদণ্ডকে বুলন্দ করা হয় তখনই তাকে এর তুলনায় প্রার্থনীয় মানদণ্ডের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত ও প্রগতিশীল পরিলক্ষিত হয়।

৩. শাশ্বত ঃ মানব রচিত আইনের মুকাবিলায় শরীয়তী বিধানের তৃতীয়তম পার্থক্যজনিত যেই গুণ-বৈশিষ্ট্য তাকে এ থেকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলে তা হচ্ছে তার চিরন্তনী ধরনটি অর্থাৎ সর্বকালের, সর্বযুগের ও সমগ দেশের জন্য তার আদর্শিক দিকটি একইরূপে বহাল থাকা। আবর্তন-বিবর্তনের গাড়ীটি তার উপর থেকে যতই পথ অতিক্রম করে যাক না কেন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তমদ্দুনের ক্ষেত্রে মানব জীবনে যতই বিপ্লব হোক না কেন, শরীয়তী বিধানের ঘোষণাবলী কখনোই কোনরূপ বিবর্তন সংস্কার ও সংশোধনকে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নয়। চিরন্তনতার এহেন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে গতিশীল এবং প্রত্যেকটি যুগ-যমানা, স্থান ও দেশের উপর পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হবার পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী।

আইন প্রণয়নে ইসলামী কর্মপন্থা

ইসলামী শরীয়ত মানুষের সমস্যার সমাধান দেয়। মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান ইসলামের নিকট হতে গ্রহণ করা—সে সমস্যা পার্থিব হোক বা পারলৌকিকই হোক। এ কথাটি জানা সত্ত্বেও শরীয়তী বিধানের মধ্যে বর্তমান যুগের মানব রচিত আইন-কানূনের ন্যায় বিশদ বিবরণ ও কোন ঘোষণা বর্তমান পাওয়া যাবে না, যা প্রতিটি আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ব্যাপারে বিধান জারি করে থাকে। শরীয়তী বিধান শুধু বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সাধারণ ঘোষণা দ্বারা মৌলিক বিধান জারি করে। যদি কোথাও সে কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ের ক্ষেত্রে তার বিধান জারি থাকে, তবে তা এদিক দিয়েই যে তা ঐ মৌলিক ও সাধারণ ঘোষণারই অন্তর্ভুক্ত। আর অনেক আনুষঙ্গিক বিধানই মৌলিক বিধানের অধীনে এসে থাকে।

সেই সকল মৌলিক বিধানের প্রতিও ইসলামী আইন প্রণয়নের সাধারণ কর্মনীতির আলোকে আমাদের গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, যার জন্য শরীয়তের ঘোষণাবলী বর্তমান রয়েছে। আর তা ইসলামী জীবন বিধানের সেই মহান সৌধ—ইমারতের ভিতর অনুসন্ধান করা উচিত, যাকে ইসলামী আইন প্রণয়নের নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতি দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। যেই কর্মপন্থাকে ইসলামী শরীয়ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য করে দিয়েছে তা এমনই একটি একক কর্মপন্থা, যা তার শরীয়তী বৈশিষ্ট্যের সাথে পূর্ণরূপে সম্পর্কিত। তাকে পূর্ণতার মহত্ত্বের ন্যায় উন্নত বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করে।

সুতরাং পূর্ণতা ও মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শরীয়তী বিধানের ঘোষণাবলী সেইসব মৌলিক নীতিমালা ও দর্শন সম্পর্কে জারি করা হয়েছে, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সাফল্যময় করে। এ একদিকে যেমন সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্য দায়িত্বশীল হয়, অনুরূপ অপরদিকে মানুষের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও দয়া প্রতিষ্ঠার জন্যও দায়িত্বশীল থাকে। সে তাদেরকে কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করিয়ে দেয়

এবং তাদেরকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে আহ্বান জানায়। আর শরীয়তের বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে যে, শরীয়তী বিধানের ঘোষণাবলী সেই সকল সমসাময়িক অবস্থার জন্য জারি করা হয়নি, যার বিধানাবলী অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা, বিবর্তন এবং যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

আইন প্রণয়নে সর্বাধিনায়কগণের মর্যাদা

শরীয়তী বিধান রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ও সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলগণকে আইন প্রণয়নের অধিকার দান করেছে তখন এ অধিকার তাদেরকে শর্তহীন করে দেয়া হয়নি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিনায়ক ও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণের প্রতি এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তারা যতই নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করুক না কেন, তা শরীয়তের ঘোষণাবলীর পরিপন্থী হতে পারবে না। বরং তা শরীয়তের সাধারণ মৌলিক আদর্শ এবং তার মূল প্রাণবস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও আনুকূল্য রক্ষা করে হতে হবে। তাদের আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে শর্তারোপ আইন প্রণয়নের নিম্নলিখিত দু'টি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে ঃ

১. দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধক আইন প্রণয়ন ঃ এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের ঘোষণাবলীর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ ধরনের আইন প্রণয়ন সেই সকল বিধান ও সার্কুলারের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রাখে, যা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নিজেদের ইখতিয়ারের সীমারেখা ও কর্মগণ্ডীর মধ্যে এর দোষ ত্রুটির আলোচনার জন্য জারি করা হয়।

২. সাংগঠনিক আইন প্রণয়ন ঃ এ আইনগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সংগঠন এবং শরীয়তের সাধারণ মৌলিক নীতিমালার ভিত্তির উপর তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা। এ আইনগুলো কেবলমাত্র সেই সব ব্যাপারেই প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা বর্তমান নেই বা শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে নীরব। এ ধরনের আইন প্রণয়নের বেলায় এই শর্ত রাখা হয়েছে যে, প্রতিটি বিষয়ে সর্বপ্রথম শরীয়তের সাধারণ মৌলিক নীতিমালা এবং তার আইন প্রণয়নের মূল প্রাণবস্তুর সাথে অভিন্ন মত ও সামঞ্জস্য বিধান করে হতে হবে।

সর্বাধিনায়কগণের ইখতিয়ার ও সীমা লংঘনের বিধান

সমগ্র মুসলিম জাতি এ বিষয়ে একমত যে, কোন ইসলামী হুকুমতের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণের নিজ নিজ অধিকার সীমার মধ্যে অবস্থানকালীন সমুদয় কাজই শরীয়তের মাপকাঠিতে সঠিক ও সহীহ বলে বিবেচিত হবে কিন্তু যখনই তারা সীমারেখা লঙঘন করবে তখনই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। জাতির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ যদি শরীয়তের ঘোষণাবলী এবং তার মৌলিক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন হুকুমনামা জারি করেন, তবে তাও সহীহ বলা যাবে এবং জনসাধারণের জন্য এর অনুসরণ করাও অপরিহার্য হবে। কিন্তু শরীয়ত-বিরোধী কোন হুকুম জারি করলে তা যেমন বাতিল হয়ে যাবে, তেমনি তা বাস্তবায়নের অপরিহার্যতা থাকবে না। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, যে জিনিস বাতিল বলে গণ্য হয়, তার কার্যকারিতা যেমন থাকে না, তেমনি তা বাস্তবায়িত করাও ঠিক নয়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিম্নলিখিত ঘোষণাটিই হচ্ছে মৌল ভিত্তি ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ-

হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে যাও। আর আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের। যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের কাছে সোপর্দ করো।

—সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ-

যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করো অর্থাৎ তাঁর বিধানের পানে মনোনিবেশ করো। —সূরা আশ-শুরা ঃ ১০

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য আল্লাহ তা'আলার হুকুম দ্বারাই অপরিহার্য হয়। আর রাসূল (স) এবং জননেতাদের আনুগত্যও মূলত আল্লাহ তা'আলারই

আনুগত্য। রাসূলের আনুগত্য যেমন তিনি একজন মানুষের জননেতা হিসাবে অনিবার্য হয় না বরং রাসূল হিসাবেই অপরিহার্য হয়ে থাকে, তেমনি জননেতাদের আনুগত্য এ জন্য অপরিহার্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যে রাষ্ট্রপতি সেইজন্য নয়। তাঁরা যদি আল্লাহ তা'আলার আদেশের সীমারেখা অতিক্রম করেন, তবে এ ক্ষেত্রে তাদের হুকুম বাতিল হয়ে যায় এবং তাঁর আনুগত্য করার দরকার হয় না।

এ মর্মার্থকেই হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ –

স্রষ্টার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করতে নেই।

اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ –

আনুগত্য কেবলমাত্র সৎ ও শরীয়ত অনুমোদিত কাজে।

مَنْ اَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَّةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَ لَا طَاعَةَ –

তাদের মধ্যে কেউ তোমাদেরকে গুনাহর কাজের নির্দেশ করলে তা অশ্রবণীয় ও অনানুগত্যের যোগ্য।

রাষ্ট্রপতির অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশ নেতা বিগত শতাব্দী হতে বিভিন্ন বিষয়ে এমন শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন, যা পাশ্চাত্য দেশসমূহের আইন প্রণয়ন পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ বৈ কিছুই নয়। তারা পাশ্চাত্যের আইন কানূনের উপর এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে, সেখান থেকে তারা নিজেদের শাসনতান্ত্রিক বিধিমালা, শাস্তিমূলক আইন এবং তমদ্দুনিক ও বাণিজ্যিক নীতিমালাকেও হুবহু গ্রহণ করে নিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়তের দিকে তারা মনোনিবেশ করলেও তা অতি নগণ্য। যেমন ওয়াকফ আইন ও ক্রয় করার অধিকারী হবার (শুফার) আইন।

এ সব আইনের বড় বড় ধারা কোন কোন ক্ষেত্রে শরীয়তী ঘোষণাবলীর অনুকূল ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল হলেও ইহা ধ্রুব সত্য কথা যে, এগুলোর ধারা ও বিধানসমূহ যে শরীয়তী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তা কোনক্রমেই আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এগুলো এমনি মৌলিক ভিত্তির উপর রচনা করা হয়েছে, যা শরীয়তের মৌলিক আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ শাস্তি ও শাসন সম্পর্কিত কতিপয় ধারার কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলোর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপকে বৈধ নিরূপণ করে থাকে। মদ্যপান যেমন এদের নিকট বৈধ, তেমনি অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপও বৈধ। অথচ শরীয়ত অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপ ও মদ্যপানকে হারাম করেছে। পাশ্চাত্যের আইন-কানূন এগুলোকে বৈধ করলেও সাধারণরূপে বৈধ করে না, বরং একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত বৈধ করে থাকে।

ইসলামী দেশসমূহে পাশ্চাত্যের আইন প্রণয়নের কারণ

কেউ কেউ মনে করে যে, মুসলিম দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ পাশ্চাত্য আইন-কানূনকে এ জন্য নিজেদের জন্য গ্রহণ করেছে যে, শরীয়তী আইন তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। এ ধারণা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এ ধারণা শরীয়তের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকারই পরিচায়ক। কেননা ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে এমন সব মৌলিক বিধান রয়েছে, যদি তাকে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার ও প্রচার করা হয় তবে তা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নমুনা হতে পারে। আর অনৈসলামী দেশসমূহও এক শতাব্দী পূর্ব হতেই তাকে নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে পারতো এবং তারা নিজেদের রচিত আইনের সেই সকল সংকলন পরিত্যাগ করতো, যেগুলো নিয়ে তারা খুব গৌরব বোধ করে আসছিল। মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য আইনের অন্ধ অনুকরণের মূল কারণগুলো পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের (Impeialism) এবং ঐ দেশসমূহে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবেশ ও প্রভাব এবং মুসলিম দেশসমূহের উলামায়ে কিরামের গোঁড়ামীর মধ্যে অনুসন্ধান করা উচিত। কোন কোন ইসলামী রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যের আইনগুলো সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তির পথেই প্রবেশ করেছে। যেমন ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকাসহ কতিপয় দেশের অধিবাসীদের

দুর্বলতা তাদের সমাজের কোণায় কোণায় নতুন আদর্শের অনুপ্রবেশ, আর শাসকশ্রেণীর ইউরোপীয় অন্ধ অনুকরণের চেতনাবোধই যে এ আইন-কানূনকে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এ ধরনের দেশের মধ্যে মিসর ও তুরস্কও শামিল। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, মিসরে ইউরোপীয় আইন-কানূনের অনুপ্রবেশ খেদীব ইসমাঈলের আমল হতে শুরু হয়েছে। প্রথমত তিনি চেয়েছিলেন মিসরের শাসনতন্ত্র ও আইন-কানূন এমনভাবে রচনা করা হবে, যার উৎসমূল হবে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়ত আর যা নির্ভরশীল হবে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রসমূহের উপর। সুতরাং তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইনবিদদের নিকট এ ধরনের একটি শাসনতন্ত্র ও আইন রচনা করে দেওয়ার জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু তারা বাদশাহর এ আশা-আকঁক্ষা সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিল। কেননা তাদের নিজ নিজ ফিকাহ শাস্ত্রমতের প্রতি গোঁড়ামী ছিল। তারা শরীয়তের অযোগ্যতা বরণ করে নিল এবং নিজ নিজ ফিকাহ শাস্ত্রে গোঁড়ামীর উপর অটল হয়ে রইল। ফলে তারা ইসলামী জগতকে পথ প্রদর্শন করার একটি সুবর্ণ সুযোগ হারালো। পরবর্তীকালে অবশ্য তারা এ জন্য খুব অনুশোচনা করেছিল। আমি এ সত্যটি সম্পর্কেও পাঠকবর্গকে অবহিত করতে চাই যে, মুসলিম দেশসমূহ ইউরোপীয় আইন-কানূনকে নিজেদের জন্য যতটুকু গ্রহণ করে নিয়েছে, তা দ্বারা কোনকালেই শরীয়তী আইনের স্বেচ্ছায় বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। প্রমাণ হিসেবে আমরা আঠার শ' তিরাশি সনে মিসরীয় ফৌজদারী আইনের মুখবন্ধের কথা উল্লেখ করতে পারি। যথা,—"রাষ্ট্রের ইখতিয়ারের মধ্যে এ-ও শামিল রয়েছে যে, সে এমন সব অপরাধের ক্ষেত্রেই শাস্তি বিধান জারি করতে পারবে, যা কোন না কোন কারণে দেশের জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর হয় এবং যার কারণে সাধারণ শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আর সেই সকল অপরাধের ক্ষেত্রেও শাস্তি বিধান এবং প্রয়োগ করতে পারবে, যার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং তার কর্মনীতির পরিপন্থী বোঝায়। এদিক দিয়ে এ আইনগুলোতে শাস্তি বিধানের এমন সব বিভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো প্রয়োগ করার অধিকার শরীয়তী দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষিত। আর ইহা কোন অবস্থায়ই এ সব নির্ধারিত অধিকারগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করে না, যা শরীয়ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আসলে এ মুখবন্ধটি তুরস্কের ৬-৫-১৮৫৩ তারিখে জারিকৃত আইন থেকে গৃহীত হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশে এ ধারণা করে কখনোই ইউরোপীয় আইনের প্রবর্তন করা হয়নি যে তারা শরীয়তের বিরোধিতা করবে। যেমন করেনি প্রাচীনকালে তেমনি করছে না বর্তমান কালেও। কিন্তু এ কথা বাস্তব সত্য যে, ঐ সকল দেশে এমন সব আইন-কানূনের প্রচলন হয়ে গেছে, যা শরীয়তী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও ঘোর বিরোধীরূপে পরিচিত এবং তা প্রয়োগের বেলায় কিছু লোকের ঘোর আপত্তি তোলা সত্ত্বেও তার প্রচলন হয়েছে। সম্ভবত এর মূল রহস্য হচ্ছে এসব আইন প্রণেতাগণের বিশেষ করে ইউরোপীয়দের (মূলত) শরীয়তের সাথে কোনরূপ সম্পর্কই বর্তমান না থাকা। এখন আসুন মুসলমান আইন প্রণেতাগণের কথায়। তারা যদিও আইনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, কিন্তু শরীয়তের শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হয়নি। সুতরাং এসব লোকের দ্বারা শরীয়তী আইনের প্রণয়ন কিরূপে আশা করা যেতে পারে ?

শরীয়তের উপর বিভিন্ন আইনের প্রভাব

বাস্তব ক্ষেত্রে শরীয়তের উপর পাশ্চাত্য আইনের প্রভাব

ইউরোপীয় আইন ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার ফলে বাস্তবক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে ঐ দেশগুলোতে এমন এক বিশেষ ধরনের আদালতের সৃষ্টি, যেগুলো শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের আইন-কানূনই প্রয়োগ করে থাকে। আর এ সব আদালতে হয় ইউরোপীয়ান জজ নিযুক্ত করা হয়, অথবা স্থানীয় এমন লোকদেরকে সেখানে বিচারক নিযুক্ত করা হয়, যারা ইউরোপীয় আইন-কানূন শিখার ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকে বটে, কিন্তু ইসলামী আইন-কানূনের বেলায় তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর এ নতুন আদালতগুলোর অবস্থা হলো এমন যে, এরা নিজেরা নিজেদেরকে বিশেষ একটি সীমারেখার বাইরে প্রত্যেকটি বিষয়ে বেপরোয়া ও স্বয়ংসম্পন্ন মনে করে থাকে। ফলে শরীয়তী আইন- কানূন বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অচল ও অকেজো হয়ে পড়েছে। কেননা তারা নিজেদের আইন-কানূন ছেড়ে অন্য কোন আইন-কানূন বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলছে।

এমনিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ এ সব আইন-কানূন শিক্ষার জন্য বিশেষ এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে এবং সেখানে ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় আইন-কানূন শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। আর শরীয়তী আইনের ক্ষেত্রে তারা হয়ে থাকে বেপরোয়া- অসতর্ক। অবশ্য গুটিকয়েক শরীয়তী আইন-কানূন সেখানে শিক্ষা দেওয়া হলেও তার যে অনুশোচনামূলক ফল। তা খুবই মর্মান্তিক অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট সমগ্র আইনবিদই ইসলামী শরীয়তের আইন-কানূন ও বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থেকে যায় এবং তাকে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যোগ্যতা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখা হয়। তারা ইসলামী বিধানের বেলায় অনুশোচনার চরম সীমা পর্যন্ত অজ্ঞ থাকে। অজ্ঞ থাকে এমন জীবন-বিধানের বেলায়, সোচ্চার গলায় যার পায়রবীর দাবি করে বেড়ায় এ সকল মুসলিম রাষ্ট্র। পরিশেষে এদের এহেন

অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব এমনই জড়তা ও কুসংস্কার সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, শরীয়ত থেকে গৃহীত কতিপয় ঘোষণার ব্যাখ্যা তারা এমনভাবে করে, যা একদিক দিয়ে তাদের রচিত আইন-কানূনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করলেও শরীয়তের দিক দিয়ে কতিপয় অবস্থার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। যেমন মিসরের ফৌজদারী আইনে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাস্তিমূলক আইনকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত শরীয়তী অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার আদৌ কোন অনুমতি থাকবে না। কিন্তু পরিষ্কার ঘোষণা থাকার পরেও মিসরীয় আইনের ব্যাখ্যাকারগণ শরীয়তের মধ্যে প্রাপ্ত ঐ অধীকারগুলোর শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় মনে করে নি। বরং তারা শুধু ঐ অধিকারগুলোর শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করে নিয়েছে, যা ফরাসী আইন-কানূনের মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়। আর তা-ও ফরাসী আইনের ব্যাখ্যাকারিগণের সংকলিত পন্থাই গ্রহণ করে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ফরাসী শিক্ষাবিদদের কথিত মতের অন্ধ অনুকরণ করা হয়। মিসরীয় ব্যাখ্যাকারিগণ এ কর্মপন্থা দু'টি কারণে গ্রহণ করে নিয়েছে। প্রথমত তারা শরীয়তের শিক্ষা গ্রহণ করেনি, ফলে তারা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণেই এ পথ গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত তারা নিজেদেরকে সাধারণভাবে ইউরোপীয়ান এবং বিশেষভাবে ফরাসী মতবাদ ও ভাবধারার অনুগত বানিয়ে নিয়েছে। তারা যে বস্তুকে বৈধ বলে থাকে, এরাও সেই বস্তুকে বৈধ বলে। আর তারা যা কিছু অবৈধ মনে করে এরাও তাকেই অবৈধ ভেবে থাকে। সুতরাং ইউরোপীয় আইন বিশারদগণ ইসলামের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রাখতে পারে তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

দর্শনের দিক থেকে শরীয়তের উপর মানব রচিত আইনের প্রভাব

বাস্তব ক্ষেত্রে মানব রচিত আইনের বিষাক্ত প্রভাব অধিকাংশ শরীয়তী বিধান অকেজো হয়ে পড়লেও দর্শন ও আদর্শের দিক দিয়ে শরীয়তী বিধানের উপর তার কোনই প্রভাব পড়েনি। শরীয়তের বিধান ও ঘোষণাবলী পূর্বে যেমন রূপে ছিল বর্তমানেও ঠিক তদ্রূপই রয়েছে। শরীয়তের বিধানসমূহের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ সর্বাবস্থায়ই অপরিহার্য। শরীয়ত ও মানব রচিত আইন উভয়ের দাবি একই। কেননা শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের মূলনীতি হচ্ছে এদের কোন ধারা

বা ঘোষণাকে যদি কোন বস্তু রদ করে দিতে পারে, তবে এর সমশক্তি সম্পন্ন অথবা এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধারা ঘোষণা হতে হবে। অর্থাৎ শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে জারিকৃত কোন ঘোষণা অথবা তা এমন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে হবে, যার উপর বৈধভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। আর সেই ব্যক্তির ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান বা সম ক্ষমতাবান হতে হবে, যারা জারিকৃত আইনকে রদ করতে চায়।

সুতরাং শরীয়তী বিধানকে রদ করার মত যোগ্যতা একমাত্র কুরআন সুন্নাহরই রয়েছে। অথবা আমাদের কাছে যা কিছু আইন-কানূন বর্তমান রয়েছে তাকে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহর দ্বারাই রদ করা বা বাতিল বলে ঘোষণা দেওয়া সম্ভব। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যেমন আর কোন কুরআন আগমনের সম্ভাবনা নেই, তেমনি আল্লাহ্‌র তরফ হতে ওহী আগমনের পথও সম্পূর্ণ বন্ধ এবং নতুন কোন সুন্নাতের আবির্ভাব হবারও কোন পথ নেই। কেননা নবী করীম (স)-এর দুনিয়া হতে চলে যাবার সাথে সাথে ওহীর পন্থাসমূহও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। সুতরাং এখন কোন সম্ভাবনাই নেই যে আমাদের মানবিক আইন প্রণয়নের প্রতিষ্ঠানগুলো যা কিছু জারি করবে তা কুরআন-সুন্নাহর ন্যায়ই হবে অথবা সেগুলো আইন প্রণয়নের এমন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের জন্যই সংরক্ষিত। এর চেয়ে অধিক বলা সম্ভব নয় যে আমাদের কর্মকর্তাগণের আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার বলতে কিছুই নেই। তাদের যা কিছু অধিকার রয়েছে তা হলো তাদের প্রায়োগিক অধিকার ও সাংগঠনিক অধিকার। এদিক থেকে এখনো আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলেরই। আর এ প্রণয়ন ক্ষমতা রসূলের জন্য তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত ছিল। ইনতিকালের পর আর কারুর জন্য প্রণয়ন অধিকার নেই।

মানব রচিত আইন ও শরীয়তী আইনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

মানব রচিত আইনের পরিবর্তে শরীয়তী আইনের অপরিহার্যতা

মানব রচিত আইন-কানূনগুলো, যখন শরীয়তী বিধানের পরিপন্থী এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তখন মানব রচিত আইনের হুকুমকে পরিত্যাগ করে শরীয়তের বিধানকে তার স্থলে কার্যকরী করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অপরিহার্যতার কারণ তিনটি।

১. ইসলামী শরীয়তের ধারা ও ঘোষণাবলী সর্বদাই এক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর মধ্যে কোনরূপ সংস্কার-সংশোধন হয় না। কিন্তু মানব রচিত আইন-কানূনগুলো সংস্কার ও সংশোধনযোগ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে শরীয়তী বিধানের ধারা ও ঘোষণাবলী মানব রচিত আইনের ধারা ও ঘোষণার তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

২. শরীয়তী বিধান তার পরিপন্থী ও বিরুদ্ধবাদী সকল আইন-কানূন ও বিধানকে বাতিল ঘোষণা করে এবং তার অনুকরণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। এ বিষয়টি ইতিপূর্বে আমি বিশদরূপে আলোচনা করেছি। সুতরাং শরীয়তী বিধানের পরিপন্থী ও বিরোধী সকল আইন-কানূন অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ তা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হতে দূরে সরিয়ে রাখে।

৩. শরীয়তী বিধানের পরিপন্থী আইনগুলো বিরোধিতার কারণে তার কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং আইন যখন তার কার্যকারিতা নিজেই নষ্ট করে দেয়, তখন আর তার প্রতিষ্ঠিত হবার কোনই স্থান বর্তমান থাকে না। অতএব, এ কারণেই তা সাধারণভাবে প্রয়োগের অযোগ্য হয়ে যায়। আর আইনের নীতিমালার কথাও তাই।

শরীয়তের পরিপন্থী আইনের অসারতা

মানব রচিত আইনগুলোর ভিত্তি এ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে যে, তা সমাজের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করে দেবে, সমাজের শান্তি- শৃঙ্খলার জন্য সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা চালাবে এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাহায্য

করবে। আর সমাজের লোকদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করবে। কোন সমাজের প্রয়োজনের মধ্যে তার মৌলিক আদর্শ ও বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার হিফাজত ও সংরক্ষণ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক ব্যবস্থাপনা ইসলামের উপর (যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে নেই, কিন্তু দর্শন ও আদর্শের দিক দিয়ে) অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত। আর তথাকার জনসাধারণের অধিকাংশ ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী। সুতরাং সেখানের মানব রচিত আইন-কানূনগুলো ইসলামী শরীয়তের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারবে। কিন্তু এ আইনগুলোকে আমরা যেরূপ মনে করছি আসলে তা সেরূপ নয়। সেগুলোকে আমরা শরীয়ত পরিপন্থী হতে দেখছি। এ কারণে মানব রচিত আইন-কানূনগুলো শুধু শরীয়তের গণ্ডি-সীমা হতেই খারিজ হয়ে পড়ে না বরং তা সেইসব নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, যার উপর মানব রচিত আইন-কানূনগুলো নির্ভরশীল। আর এর দ্বারা সেই উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়, যার জন্য এ আইনগুলোকে রচনা করা হয়েছিল। সুতরাং এ আইনগুলো এমনই যে, এগুলো কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তেমনি শরীয়তের দিক দিয়ে কোন কিছু সফল করতেও পারে না। যদি আমরা ইসলামের মূল বিধান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও রাখি, তবে এ কথা উপলব্ধি করতে আদৌ কষ্ট হয় না যে, ইউরোপীয় সমাজের মুক্তি এবং সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যে আইন-কানূন রচনা করা হয়েছে, সেই আইন-কানূন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অশান্তি, মতানৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে এবং আচার-অনুষ্ঠান ও সভ্যতা সংস্কৃতিকে মিটিয়ে ফেলার কাজ করে। আর এ আইন-কানূনগুলোর প্রতি এ সব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের অসন্তুষ্টি ও অসুখী থাকার এটাই সর্বপ্রথম কারণ নয়। বরং তাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ মতানৈক্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করাই হলো এর সবচেয়ে বড় কারণ।

১. ইসলাম কোন মুসলমানকে শরীয়তী বিধান ব্যতীত কোন কিছুকে আইনগতভাবে বৈধ বলে সমর্থন করার অনুমতি দেয়নি। যদি কেউ তা সমর্থন করে তবে তা হবে অবৈধ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ দু'প্রকার ঃ (ক) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা ও (খ) মানবিক কুপ্রবৃত্তি ও

ষড়রিপুর অনুবর্তী হওয়া। আল্লাহ্‌র রসূল যা নিয়ে আসেন নি, তা সবই হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ-

যদি তারা আপনার দাওয়াতে সাড়া না দেয় তবে আপনি জেনে রাখুন যে, তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। যে লোক আল্লাহ তা'আলার হিদায়ত ছেড়ে কুপ্রবৃত্তির পায়রবী করে, তার চেয়ে বড় গুমরাহ আর কে হতে পারে? —সূরা আল-কাসাস ঃ ৫০

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ- إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ -

অতঃপর আমি আপনাকে দীনের একটি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করে যান এবং আপনি অজ্ঞদের কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তা কখনোই আপনার জন্য কোন কাজে আসবে না। অত্যাচারীরা পরস্পরের বন্ধু। আর পরহিযগার মুত্তাকীদের পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

—সূরা আজ-জাসিয়া ঃ ১৮-১৯

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءَ- قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের কাছে অবতারিতের অনুসরণ কর। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে তার পায়রবী করবে না। (কিন্তু তোমরা খুব কমই নসীহত গ্রহণ করে থাকো।

—আলা-আ'রাফ ঃ ৩

২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের তাঁর আদেশ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি খুশি ও সন্তুষ্ট থাকার অনুমতি দান করেন নি। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে হাকিম ও বিচারক মনোনীত করা অথবা তার নিকট মীমাংসার প্রত্যাশী হবারও অনুমতি তিনি দেননি। বরং তিনি তাঁর হুকুম ও বিধান ব্যতীত অন্য সকল হুকুম-বিধান ও মতবাদসমূহকে অস্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম ও বিধান ছাড়া অন্য কোন হুকুম ও বিধানের প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকাকে কঠোর গুমরাহী এবং শয়তানের আনুগত্যকরণ বলে অভিহিত করেছেন যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا –

(হে নবী)! আপনি কি ঐ লোকদেরকে দেখছেন না, যারা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের উপর অবতীর্ণ বিষয়বস্তুর প্রতি ঈমান রাখার দাবি করে থাকে ? কিন্তু এ লোকেরা নিজেদের বিচার-ফয়সালা তাগুত দ্বারা করিয়ে নিতে চায়। অথচ ওদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান ওদেরকে গুমরাহীর দূর-দূরান্তে নিক্ষেপ করে ফেলতে চায়।" —সূরা আন-নিসা ঃ ৬০

সুতরাং যে কোন লোকই আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের দেয়া হিদায়ত ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ দ্বারা স্বীয় জীবন সমস্যার সমাধান নিতে চায়, তাদের তাগুতকে স্বীয় ফয়সালাকারী ও সমাধানকারীরূপে সমর্থন করে নেওয়া এবং তার নিকট ফয়সালা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। ঐ সব বস্তুকে তাগুত বলা হয়, যা বান্দা হব্যার সীমা অতিক্রম করে মাবূদ বা অনুকরণীয় হওয়ার পদমর্যাদা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি জাতির তাগুত হলো তারাই, যাদেরকে মানুষ আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল (স) ব্যতীত নিজেদের মীমাংসাকারী ভেবে থাকে অথবা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের বন্দেগীতে লেগে যায় অথবা জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করে

তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। অথবা ঐ বস্তুগুলোর আনুগত্য এমনভাবে করে যায় যে, আনুগত্য পাবার অধিকারী যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তা একটুও উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং যারাই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনবে তাদের জন্য গায়রুল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আনুগত্য করা আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত অন্য কারো হুকুমকে বৈধ আইন বলে সমর্থন করে নেওয়ার অনুমতি তাদের জন্য কোনক্রমেই নেই।

৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা কোন মু'মিন নর-নারীকে এ আনুমিত দেননি যে, তারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের ইচ্ছার মুকাবিলায় নিজেদের জন্য যথেচ্ছাচারী হয়ে যাবে। বরং সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যেমন পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলাই ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূল কোন বিষয় চূড়ান্তরূপে ফয়সালা বা মীমাংসা করে দেওয়ার পর সেই ব্যাপারে কোন মু'মিন নর-নারীর জন্য কোনরূপ ইখতিয়ার অবশিষ্ট থাকে না। —সূরা আহযাব ঃ ৩৬

৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বিচার ও শাসন ইত্যাদি সবকিছু তাঁর নাযিলকৃত হিদায়তের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রেখে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা তাঁর নাযিলকৃত হিদায়তমাফিক বিচার ও শাসন চালায় না, তাদেরকে তিনি শ্রেণীভেদে কাফির,জালিম ও ফাসিক নামে অভিহিত করেছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -

যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত হিদায়তমাফিক বিচারকার্য পরিচালনা করে না (বরং অস্বীকার করে), তারা কাফির । —সূরা মায়িদা ঃ ৪৪

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত হিদায়ত ও বিধান মাফিক বিচার করে না, তারা জালিম । —সূরা মায়িদা ঃ ৪৫

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান মাফিক বিচার পরিচালনা করে না, তারা ফাসিক । —সূরা মায়িদা ঃ ৪৭

কুরআন ব্যাখ্যাতা ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে যারা আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত নতুন কোন মতবাদ আবিষ্কার করে অথবা আল্লাহ তা'আলার অবতারিত বিধান বা তাঁর নির্দেশের আংশিক পরিহার করে, আর বিনা-ব্যাখ্যায় যদি নিজের এহেন কাজকে সহীহ বলে মনে করে, তবে শ্রেণীভেদে আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত ঘোষণাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যদি কোন লোক চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অপবাদ ও অবৈধ যৌনক্রিয়ার শাস্তিকে মানব রচিত আইন-কানূন ও বিধানকেই মনে-প্রাণে সমর্থন করার দরুন পরিহার করে, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফির হবে। আর যদি এ কারণ ব্যতীত বিদ্রোহী ও অস্বীকারের মনোভাব নিয়ে নয় বরং অন্য কোন কারণে এমনি কাজ করে তবে সে জালিম নামে অভিহিত হবে। আর যদি বিচারের বেলায় কারো অধিকার নস্যাৎ করে অথবা ইনসাফকে পরিহার করে, তখন সে ফাসিক নামে অভিহিত হবে।

৫. আল্লাহ তা'আলা সেই ঈমানদারদের ঈমানের স্বীকৃতি দেন না, যারা নিজেদের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে তার রসূলকে ফয়সালাকারী হিসাবে গ্রাহ্য করে না। যেমন—কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

হে মুহাম্মদ (স)! তোমার প্রভুর কসম করে বলছি যে, এ সব লোক তখন পর্যন্ত মু'মিন নামে অভিহিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক মতানৈক্যের ক্ষেত্রে আপনাকে সালিস ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে না নেয়। অতঃপর আপনি যা কিছু ফয়সালা দেবেন সে বিষয়ে তাদের মনে বিন্দুমাত্র সংকীর্ণতা অনুভূত হবে না। বরং অবনত মস্তকে তা সমর্থন করে নেবে। —সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫

৬. শরীয়ত পরিপন্থী প্রত্যেকটি বস্তুই মুসলমানদের জন্য হারাম। তা করার জন্য সর্বোচ্চ শাসক মহলের তরফ হতে নির্দেশ দেয়া হোক না কেন, অথবা তারা মুবাহ ও বৈধ বলে ঘোষণা করুক না কেন! কেননা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামোর অধিকারকে এরূপ শর্তাধীন করা হয়েছে যে, তার প্রতিটি আইন প্রণয়ন শরীয়ত মাফিক হতে হবে এবং তার সাধারণ মৌলিক নীতিমালার সাথে একমত হতে হবে। আর তার আধ্যাত্মিক ভাবধারার সাথেও রাখতে হবে পূর্ণ সংযোগ। প্রশাসনিক কাঠামো যদি এই সীমারেখা অতিক্রম করে যাওয়াকে মুবাহ মনে করে, তবে তাদের এহেন কাজ দ্বারা হারাম আইন-কানূনগুলো কস্মিনকালেও হালাল হবে না। আর কোন মুসলমানের জন্য এর অনুকরণ করার বৈধতাও থাকতে পারে না। বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এহেন অবৈধ শরীয়তবিরোধী আইনের বিরোধিতা করা এবং এর বাস্তব প্রয়োগ ও প্রচলনকে বাধা দেওয়া ফরয। কেননা রাষ্ট্রনায়ক ও মোড়লদের আনুগত্যও জনগণের জন্য শর্তহীনরূপে অপরিহার্য নয়। বরং তারা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা এবং রসূল (স) নির্দেশিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করবে কেবল ততক্ষণের জন্যই তাদের আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কালামে মজীদেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের পায়রবী করো আর পায়রবী করো তোমাদের মধ্যকার নেতার। যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে ঐ বিষয়ের সমাধান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের কাছে সোপর্দ করো। —সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯

وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه الى الله -

আর যে বিষয়েই তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হোক না কেন, ফয়সালার জন্য তা আল্লাহ তা'আলার কাছে সোপর্দ করো।

—সূরা আশ-শুরা ঃ ১০

আর হাদীসেও এহেন আনুগত্যের সীমরেখাকে পরিষ্কাররূপে অংকিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لا طاعـة لمخلوق فى معصية الخالق –

স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

وانما الطاعـة فى المعروف –

আনুগত্য একমাত্র মা'রূফ ও শরীয়ত অনুমোদিত কাজেই হতে হবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রনেতা সম্পর্কে পরিষ্কাররূপে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له و لا طاعة –

রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের গুনাহর কাজের নির্দেশ দেয়, তবে সে নির্দেশ শুনো না এবং তার অনুসরণ করো না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণের আনুগত্য যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের অধীন, সে ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম, ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সকলে একমত। আর এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, যদি কোন সৃষ্টির নির্দেশ মানতে গিয়ে স্রষ্টার সাথে নাফরমানী করা হয় বা তাঁর হুকুমের পরিপন্থী কোন গুনাহর কাজ করা হয়, তবে এমন নির্দেশ মেনে নেওয়া আদৌ জায়েয নেই। আর যদি রাষ্ট্রের কোন আইন-কানূন শরীয়তের সর্ববাদীসম্মত পরিষ্কার ঘোষণাসমূহের বিরোধী হয় বা শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তুকে জায়েয ও মুবাহ করে দেয়— যেমন অবৈধভাবে যৌনক্রিয়া করা, নেশার দ্রব্য পান করা, আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত সীমারেখাকে নষ্ট করে দেওয়া এবং শরীয়তকে বাস্তব ক্ষেত্রে অকর্মণ্য করে দেওয়া। আর এমন আইন-কানূন প্রণয়ন করা যার অনুমতি শরীয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে আদৌ প্রদান করেনি, তা আসলে কুফরী ও মুরতাদেরই শামিল।

কোন মুসলমান শাসক যখন ইসলাম হতে দূরে সরে যায়, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা মুসলমানদের ফরয হয়ে পড়ে। আর বিদ্রোহের সর্বনিম্ন শ্রেণীর বিদ্রোহ হলো শরীয়তের খিলাফ এবং উহার বিধি-নিষেধ ও হুকুম-আহকামকে বাস্তবায়িত না করা, আর শরীয়তের সাথে নাফরমানী করা।

৭. নিঃসন্দেহে শরীয়তী বিধান এমন একটি অবিভাজ্য বিধান, যা শ্রেণীবিভক্তের আদৌ উপযোগী নয়। সে কোনরূপ পার্থক্য ও বিভক্তি- করণকে আদৌ গ্রহণই করে না। সুতরাং শরীয়তী বিধানের কতিপয় বিধানকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলমানের সন্তুষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে নীরব ভূমিকা প্রদর্শন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বস্তুত এই হচ্ছে ইসলামের মূলতাত্ত্বিক বিষয়ের গুটিকয়েক বিষয়, যা কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণাবলীর আলোকে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর প্রকৃতপক্ষে মুসলমান তো সে ব্যক্তিই, যে ইসলামকে এমনিভাবে বুঝেছে এবং তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান এনেছে। আর এহেন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার উপরই প্রত্যেক মুসলমানের কথা ও কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। এখন ঐ সকল আইন-কানূনের আলোচনায় আসুন—যেগুলো মূলত বিশেষ একটি আলাদা বিশ্বাস, দর্শন ও ধ্যান-ধারণার সহায়করূপে রচনা করা হয়েছে। এগুলো ইসলামী শরীয়তের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়ে তার উপর জুলুম-অত্যাচার করছে। এমনিভাবে সে দেশের জনসাধারণকে তার ছাঁচে এমনভাবে ঢালাই করে গঠন করতে চাচ্ছে, যা শরীয়তী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম এগুলোকে কোনরূপেই বরদাস্ত করে না। আমি পুনরুল্লেখ করছি যে, বর্তমানে মুসলমান দেশসমূহে প্রচলিত মানব রচিত আইন-কানূনগুলো নিজেদের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা থেকে অনেক দূর-দূরান্তে সরে পড়েছে। কেননা এগুলো জনসমাজের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ অবিচার, অপরাধ- প্রবণতা এবং সাধারণ ভাবধারাকে ধ্বংস করার কারণে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া এ আইন-কানূন অনাচার-অবিচার ও ফিতনা-ফাসাদকে উস্কানিদানের একটি অস্ত্র এবং সামাজিক জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিসম্বাদ, অনৈক্য ও অসুস্থতার ইন্ধন যোগানোর উপকরণে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের শ্রেণীগত পার্থক্য

ইসলামী শরীয়তে মুসলমানদের বিবেক-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী আমরা তাদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। এর প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো ঐ সব লোক যাদের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে কোনরূপ সম্পর্কই নেই, যেমন অশিক্ষিত জনসাধারণ। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোক, আর তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত সুধীবর্গ। আমি এ তিনটি শ্রেণীকে নিয়েই আলোচনা করছি ঃ

১. অশিক্ষিত শ্রেণী

এ অশিক্ষিত জনসাধারণ বা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষার অধিকারী লোকগণ ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল, যারা দীন-ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছুটা জ্ঞান রাখে। এরা জীবনের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে যেমন কোন জ্ঞান রাখে না, তেমনি এর জন্য কোন সমাধানও দিতে পারে না। এরা ইবাদত-বন্দেগী ও আচার-অনুষ্ঠানের যৎকিঞ্চিৎ ধারণা ব্যতীত ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় রয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ইবাদত-বন্দেগী শুধু অভ্যাসের দাস হিসেবে সম্পন্ন করে এবং এ ব্যাপারে নিজ নিজ বংশাবলী ও পীর-মাশায়িখদের অনুকরণ করে থাকে। এদের মধ্যে ইবাদত-বন্দেগী করণে ইসলামী শিক্ষা-দিক্ষা ও ব্যক্তিগত ইলম জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হওয়ার মত খুব কম লোকই পরিলক্ষিত হয়।

এ শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই হচ্ছে মুসলমান। সমস্ত মুসলিম দেশে এদের সংখ্যা শতকরা আশি ভাগের কম নয়। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত শিক্ষিত সমাজ ও শিক্ষিত লোকদের আদর্শেরই অনুকরণ করে এবং তাদের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করে। তাদের গতিধারা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারাই এরা প্রভাবিত হয়। আর এ শিক্ষিত লোকগণ, চাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হোক বা প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হোক, তা বিচারের কোন বালাই নেই। তবে এদের মধ্যে এতটুকু উপলব্ধি জ্ঞান অবশ্যই বর্তমান রয়েছে—যে বিষয়ের ব্যাপারে তারা মনে করে যে, ইহা দীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে তারা প্রাচ্য শিক্ষায়

শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের গতিধারার সামনেই আনুগত্যের মাথা অবনত করে দেয়। কেননা এ লোকেরা এ সব ধর্মীয় বিষয়ে আন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শী হয়ে থাকে। কিন্তু যে সব বিষয় তাদের জানা না থাকে যে, এ বিষয়গুলো ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সে ব্যাপারে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের ধ্যান-ধারণা ও গতিধারার সম্মানেই আনুগত্যের মাথা নুইয়ে দেয়।

ইসলামের আলিম শ্রেণীর লোকদের পক্ষে এ শ্রেণীর লোকদের উপর পূর্ণরূপে ইসলামী প্রভাব বিস্তার করা এবং তাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলামের আলোকে দেওয়া খুবই সহজ। আর তা কেবল এ অবস্থায়ই হওয়া সম্ভব যখন তারা জনসাধারণকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হবে যে, পার্থিব জীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার সম্পর্ক ইসলামের সাথেই একান্তরূপে সংশ্লিষ্ট। আর তাদের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, যতক্ষণ না নিজেদের পার্থিব সকল বিষয় ও সমস্যার সমাধান দীন-ইসলামের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন না হবে। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় আলিম সমাজ ইসলাম জগতের এহেন বিরাটসংখ্যক লোকদের প্রতি আদৌ কোন ভ্রুক্ষেপই করেন না। এদিক দিয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে পড়েছেন এবং তাদের অজ্ঞানতার আঁধারে ফেলে রেখেছেন। এ অশিক্ষিত জনসাধারণ ইসলাম হতে সম্পূর্ণ দূরে সরে থেকেও মনে করছে যে, আমরা ইসলামের সঠিক ও উজ্জ্বল রাজপথের উপরই দণ্ডায়মান রয়েছি। এক্ষেত্রে জনসাধারণের পথভ্রষ্ট হবার বড় কারণ হলো ইসলামী কাজে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের অপরাধমূলক নীরব ভূমিকা অবলম্বন করা এবং সঠিকভাবে তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান জানানোর বেলায় অলসতা ও নিষ্ক্রিয় হওয়া। আলিম সমাজ যদি উত্তম কলাকৌশল ও যুক্তি-ব্যাখ্যার সাথে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যেতেন, তবে এ অশিক্ষিত জনসাধারণ পথভ্রষ্ট হতো না।

২. পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী

এ শ্রেণীর মধ্যে ইসলাম জগতের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই শামিল রয়েছেন এবং অধিকসংখ্যক রয়েছেন মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত লোক তবে উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত লোকও এদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে পাওয়া যায়। যেমন জজ, উকীল, ডাক্তার, হাকীম, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদগণও এদের মধ্যে রয়েছেন।

উল্লিখিত লোকেরা পাশ্চাত্য ট্রেনিংই পেয়েছেন, ফলে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানের বেলায় একজন সাধারণ মুসলমান অন্ধ অনুকরণ ও অভ্যাসের দাসরূপে যতটুকু জ্ঞান রেখে থাকেন এরাও ঠিক ততটুকু জ্ঞানেরই অধিকারী হন। এদের মধ্যে অধিকসংখ্যক লোকই ইসলামী শরীয়তের তুলনায় গ্রীক-রোমান ধর্মমত, ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান এবং ইউরোপীয় আইন-কানূন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল থাকেন।

এদের মধ্যে প্রত্যেক দেশ ও শহরের সেই লোকদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায় যারা শরীয়তের কোন কোন শাখায় বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হন। তবে শরীয়ত সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা তাদের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যায়। আর এ শ্রেণীর মধ্যে শরীয়তের আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক ভাবধারা উপলব্ধি করতে পারে এমন লোক এবং ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যায় শরীয়তের প্রকৃত ধ্যান–ধারণা, গতিধারা ও মৌলিক আদর্শের প্রতি আঙ্গুলী নির্দেশ করার মত জ্ঞানের অধিকারী লোক বলতে গেলে একেবারেই নেই।

মূলত এ শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাহযীব তমদ্দুনেরই ফসল। এরা ইসলাম ও শরীয়তের বেলায় এতখানি অজ্ঞানতার তিমিরে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও মিল্লাতে ইসলামের দাবিদার এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বত্র তাদের আনাগোনা ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তারাই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তারা সুসভ্য-সুরুচি জ্ঞানসম্পন্ন এবং মজবুত ও দৃঢ় কর্মচরিত্রের অধিকারী। তারা ঈমানের ক্ষেত্রেও মজবুত। আর তারা নিজেদের জ্ঞান মাফিক অনুষ্ঠানাদি পালন করতে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। তাদের মধ্যে শিক্ষা নেওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু এরা শরীয়তী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করার যোগ্যতা রাখে না। কেননা এর জ্ঞান থেকে তারা অনেক দূরে। এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করার অভ্যাসও তাদের নেই। অবশ্য শরীয়তী গ্রন্থাবলীর বিষয়াবলীর আলোচনা খুব সহজ পদ্ধতিতেও করা হয়নি। সুতরাং ধৈর্যশীল ছাড়া এত দীর্ঘালোচনার অধ্যয়ন অন্যদের জন্যও সহজ নয়। কেননা ঐ কিতাবগুলো আজ হতে হাজার বছর পূর্বের নিয়ম-পদ্ধতি মাফিক লিখিত হয়েছে। তাই বর্তমান যুগের মন-মস্তিষ্ক এবং আধুনিক অধ্যয়ন ও গবেষণা পদ্ধতির সাথে

পরিচিত লোকগণ এ থেকে খুব সহজে লাভবান হতে পারে না। এমন লোকদের জন্য এটা সহজ নয় যে, তারা যদি কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার প্রয়াসী হয়, তবে সাথে সাথে তা এ ধরনের কোন কিতাব থেকে লাভ করতে পারবে না। বরং তার জন্য এ কিতাবের কোন একটি অধ্যায় বা কয়েকটি অধ্যায়কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পরই তারা নিজেদের বাঞ্ছিত বিষয়কে লাভ করতে সক্ষম হবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এসব অধ্যয়নকারীকে উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে চরমভাবে নিরাশ হতে হয়। অতঃপর হঠাৎ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা তাদের বাঞ্ছিত বিষয়গুলোকে কিতাবে এমন স্থানে পেয়ে বসে, যেখান থেকে পাবার প্রথম হতে কোনরূপ আশাই ছিল না। আবার কোন সময় এমনও হয়ে থাকে যে, পাঠক কোন দীনী কিতাবের কোন বিষয় যখন অধ্যয়ন করতে থাকে, তখন শরীয়তের পরিভাষাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার দরুন তারা বিষয়টির মূল তাৎপর্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয় না। অথবা তারা সেইসব মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকার দরুন মূলতত্ত্ব অনবহিতই থেকে যায়। আমার এমন বহু লোকের সাথেই জানাশোনা রয়েছে যারা গুরুত্ব ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে ইসলামী শরীয়তের গবেষণা ও পর্যলোচনার ইচ্ছুক হয়েও তারা এ কাজে নিষ্ফল হয়েছে এবং তাদের মন-মগজ অস্থির ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা তাদের ধৈর্য ও সংকল্পকে কিতাবের মূলভাষা, ব্যাখ্যা ও টীকার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোক যদি আধুনিক নিয়ম- পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত কোন শরীয়তী গ্রন্থ পেতো তবে তাদের শরীয়তকে শিক্ষা করে নেওয়ার এবং তা থেকে উপকৃত হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

এ পাশ্চাত্য শিক্ষায় লোকেরা শরীয়ত সম্পর্কে শুধু বিস্ময়করই নয় বরং হাস্যাস্পদ দাবিও উত্থাপন করে থাকে। তাদের মধ্যে কতিপয় লোক এ দাবিও করে যে, রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আবার কতিপয় লোক যদিও ইসলামকে রাজনীতির মিলন-সেতু মনে করে, তবুও তারা দাবি করে যে, শরীয়ত বর্তমান যুগের পার্থিব সমস্যাবলীর সমাধান দিতে অক্ষম। এ ব্যাপারে তারা বলে যে, শরীয়তের কতিপয় বিধান সমসাময়িক যা বর্তমান অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম নয়। আবার কতিপয় লোকের খেয়াল হলো, শরীয়ত বর্তমান যুগের জন্যও কল্যাণময়ী ও ফলপ্রসূ এবং উহার বিধানাবলী নিঃসন্দেহে চিরন্তন। কিন্তু কতিপয় বিধানের প্রয়োগ কোনক্রমেই এ যুগে সম্ভব

নয়। কেননা এর দ্বারা অন্যান্য সেই রাষ্ট্র যারা ইসলামকে জানে না, বুঝে না, তারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোকের এ অভিযোগও রয়েছে যে, ইসলামের ফিকাহ শাস্ত্র হচ্ছে অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদের রায় ও অভিমতেরই একটি সংকলন। উহা কুরআন-সুন্নাহর উপর খুব কমই নির্ভরশীল।

এই হচ্ছে এ শ্রেণীর বিভিন্ন লোকের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। কিন্তু এ দাবিগুলো সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। এর পিছনে কোন যুক্তি নেই। কেননা এ অভিমতগুলো সেই লোকেরাই উত্থাপন করে থাকে, যারা শরীয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর যারা যে বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখে না, তাদের জন্য সে সব বিষয়ে কোনরূপ সমাধান দেওয়াও ঠিক নয়। যদি কোন সমাধান দিয়েই ফেলে, তবে তা মৌখিত দাবি ছাড়া কিছুই নয়! এর দ্বারা নিশ্চিত করে কিছুই বোঝা যায় না। সুতরাং এটা প্রমাণহীন দাবি। এ দাবিগুলো আসলে দু'টি কারণেই হয়েছে। প্রথম শরীয়ত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা আর মানব রচিত আইন থেকে আহরিত পাণ্ডিত্যের আলোকে শরীয়তকে অবলোকন করা ও বাস্তব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা চালান। এ দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, এর মান্যকারীরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে লিপ্ত। এ শ্রেণীর কোন লোক যদি কোন বিষয়ে অভিমত উত্থাপন করে, তবে তাদের মধ্য হতেই কিছু লোকের দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। যে অট্টালিকাকে গগনচুম্বী করার জন্য কিছু লোক আদাপানি খেয়ে লেগে যায় সেই অট্টালিকাকে ধ্বংস করে তাদের মধ্যে অপর কিছু লোক। আমরা নিম্নে এ অভিমতগুলোকে আলোচনা করে তার অসারতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো।

১. ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সুধিমণ্ডলী এ অভিমত পোষণ করে থাকেন যে, ইসলাম একটি ধর্ম আর ধর্ম হলো মানুষ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যবর্তী একটি সম্পর্কের নাম। রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে এর কোনরূপ সম্পর্কই থাকা উচিত নয়! কিন্তু যখন এ সুধীমণ্ডলীর নিকট এই প্রশ্ন রাখা হয় যে, আপনাদের এ কথা কুরআন-সুন্নাহর কোথায় আছে বলুন? তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা জবাবের ক্ষেত্রে নির্বাক এ জন্য হয় যে, তারা যেই সনদের উপর নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার ভিত্তি রচনা করে থাকে, তা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা হতে অর্জিত। সেখানে তারা এ শিক্ষাই পেয়েছে যে, ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থা এবং

গির্জা ও ধর্মীয় সংস্থা রাষ্ট্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পৃথক ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তারা এ শিক্ষায় যা শিক্ষা করেছে তা প্রত্যেক দেশের সাথেই সামঞ্জস্য হতে পারে এবং শাসনব্যবস্থার মধ্যেই এ ধ্যান-ধারণাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় বলে মনে করে। এ লোকেরা হয়ত এতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম যে, ইউরোপের নিজ সৃষ্ট সংস্থাবলী ও সভ্যতা সনদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। এ ব্যাপারে অবিসংবাদিত দলীল হবার যোগ্যতা একমাত্র ইসলামী শাসনতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। জীবন-বিধান দীন-দুনিয়া উভয়কে একত্র করে এবং ইবাদত ও নেতৃত্ব এবং নামায ও রাষ্ট্রে উভয়ের পরিচালনার ভার নেয়! তাদের এ অভিমত কেবল বাতিলই নয় বরং একটি ধাঁধা-মিথ্যা অভিমত বিশেষ।

কয়েক বৎসর পূর্বে এমন একদল যুবকের মজলিসে আমার বসার সৌভাগ্য হয়েছিল যারা সদ্য মিসরীয় কলেজ হতে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। আমরা ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমি তাদের কথাবার্তায় অনুধাবন করতে পারলাম যে, তারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় বিষয় থেকে পৃথক মনে করে। আমি তাদের এহেন 'আকীদার অসারতা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আর তাদেরকে বললাম যে, আপনারা আইন-কানূনে বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কোন দলীল পেশ করতে পারছেন না। তাদের মধ্যে একজন আমার কথার উপর কথা রেখে বললো—আচ্ছা আপনার বক্তব্যই যদি সঠিক হয় তবে আপনি এ ব্যাপারে আল-কুরআনের ঘোষণা পেশ করুন তো ? ইসলাম দীন ও হুকুমতকে একত্র করার অনুকূলে এ দলীল ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। আমি তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে বললাম—আপনারা এ ব্যাপারে সুন্নতের কোন ঘোষণার উপর নিশ্চিত থাকতে পারেন কিনা এবং তা মানেন কিনা? তারা বললো—না, আমরা এ ক্ষেত্রে কুরআন ব্যতীত অন্য কারো দলীল-প্রমাণ মানতে রাযী নই। নিঃসন্দেহে আল-কুরআনই ইসলামের মৌল বিধান। তখন আমি এর অপরাপর সঙ্গীদের পানে তাকিয়ে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তারাও এর কথাকেই সমর্থন করছে। আমি এ যুবকদের পর্যবেক্ষণ করে খুবই বিস্ময় বোধ করলাম, যারা আল-কুরআনের প্রতি এতখানি গভীর শ্রদ্ধা ও ঈমান পোষণ করে থাকে অথচ তারা নিজেরা কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত! মুসলমানদের অবস্থা দর্শনে আমার মনে খুবই

আফসোস হয় যে, তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন আল-কুরআনের দু'টি নীতিকে অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়েছে। তার একটি হলো ইসলাম দীন ও হুকুমতের মধ্যে একাত্ম সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয়টি হলো আল-কুরআন যেরূপ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামের দলীল, তদ্রূপ পবিত্র সুন্নতও প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য দলীল।

আল-কুরআনে যে খুনী, চোর, ডাকাত ও মিথ্যা যৌন-অপবাদকারীদের শাস্তির বিধান নির্ধারিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে কুরআনে বিশ্বাসী এ সকল যুবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى-

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি হত্যার কিসাস (প্রতিশোধমূলক বিধান) ফরয করে দেওয়া হয়েছে। —সূরা বাকারা ঃ ১৭৮

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ -

এক ঈমানদারকে অন্য কোন ঈমানদারের হত্যা করা বৈধ নয়। যদি কোন লোক কোন মু'মিন লোককে ভুলবশত হত্যা করে, তবে খুনীর একজন গোলাম মুক্তি করে দেওয়া বা নিহত ব্যক্তির পরিবার- পরিজনকে দীয়ত (জরিমানা) দেওয়া উচিত। —সূরা আন-নিসা ঃ ৯২

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ-

যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য নানাবিধ আচরণ করে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা বা শূলদণ্ডে চড়িয়ে মেরে ফেলা অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা বা তাদের দেশান্তরিত করা। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৩

وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا –

পুরুষ চোর ও মহিলা চোরদের হাত কেটে দাও।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ –

অবৈধ যৌনক্রিয়াকারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারো।

—সূরা নূর ঃ ২

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً –

যারা সতী সাধ্বী রমণীর প্রতি অবৈধ যৌনক্রিয়ার অপবাদ চাপিয়ে থাকে, আর তারা নিজেদের পক্ষে যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম না হয়, তবে তাদেরকে আশি দোররা লাগাও। —সূরা নূর ঃ ৪

এ ছাড়া আল-কুরআনে আরও এমন কতকগুলি ঘোষণা রয়েছে যা মানুষকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং অপরাধীর জন্য নির্দিষ্টরূপে শাস্তির বিধান করে। যেমন মুরতাদের শাস্তি। প্রশাসনিক বিধান হিসাবে যেসব শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে তা সর্বাবস্থার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি; যেমন গালিগালাজ ও ভর্ৎসনার শাস্তি, আমানত খেয়ানত করার শাস্তি ইত্যাদি।

বস্তত-এ হচ্ছে আল-কুরআনের নিষিদ্ধকৃত অপরাধ ও তার অপরিহার্য শাস্তি বিধান! আর অপরাধকে নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তি বিধানকে অপরিহার্য করে দেওয়া যে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কীয় বিষয়, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। ইসলাম যদি ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রেখা অংকিত করতো এবং এ দু'টোকে একাকার না-ই করতো, তবে এসব ঘোষণার অবতারণা কেন ? আর আল-কুরআন যদি এসব ঘোষণার প্রতিষ্ঠা এবং এর বাস্তব প্রয়োগ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে এমনিভাবে তাদের প্রতি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও অপরিহার্য করে দেয়, যা হবে মূলত এ সব ঘোষণার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যম। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া যে এ সব ঘোষণার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব রূপায়ণ হতে পারে না, তা সকলের নিকটই স্বীকৃত।

আল-কুরআন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জন্য কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত মজলিসে শূরার (পরামর্শ সভা) অনুষ্ঠানের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ –

তাঁদের (রসূল বা সাহাবাদের) (সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়) কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। —সূরা আশ-শূরা ঃ ৩৮

وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ –

হে মুহাম্মদ (স)! আপনি তাদের পরামর্শ করে (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) সকল কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৫৯

আল-কুরআনের মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দাবিরই নামান্তর। আর ইসলামী হুকুমতের জন্য এর প্রতিষ্ঠা যে অপরিহার্য তা সর্বজনবিদিত। ইসলাম যদি ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রেখা অংকন করতে চাইত, তাহলে রাষ্ট্রের রূপরেখা এবং তার ধরন ও গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে কোন উচ্চ-বাচ্য করতো না। আর আল-কুরআন ও মানুষের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনের আদান-প্রদান ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের আলোকে 'আদল-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করাকেও অপরিহার্য করে দিত না। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّو الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا – وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ –

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আমানতী দ্রব্য সামগ্রী সঠিক প্রাপকদের নিকট সোপর্দ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে যে, যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা কর, তখন ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সাথে তা কর। —সূরা নিসা ঃ ৫৮

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ –

ওদের মধ্যে আল্লাহ্র প্রেরিত বিধান মুতাবিক মীমাংসা করো।

—সূরা আল-মায়িদা ঃ ৪৯

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

যারা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বিধান মাফিক বিচার-ফয়সালা করে না (বরং অস্বীকার করে) তারা কাফির। —সূরা আল-মায়িদা ঃ ৪৪

সামাজিক জীবনে পারস্পরিক লেন-দেন ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবিত সমস্যার মীমাংসা ও বিচার করা যে রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তা সর্বজনস্বীকৃত। আল-কুরআন এমনিভাবেই ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে জোরালো সম্পর্ক ও দৃঢ় বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত করে থাকে আর পরিষ্কার নির্দেশ দেয় যে, রাষ্ট্রের বিচার ও কার্যাবলীর ভিত্তি ঐ সকল মৌলিক নীতিমালার আলোকে রচিত হতে হবে, যা ইসলাম মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে। এ ছাড়া আল-কুরআন সৎ ও ন্যায় কাজের প্রতি আদেশ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের নিষেধ করণের জন্য ঘোষণা দিয়েছে। যেমন, এর একটি অর্ডিন্যান্সের ভাষা শুনুন ঃ

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্যে হতে এমন একটি দল সৃষ্টি হওয়া উচিত, যাদের কাজ হবে ন্যায় ও সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা। —সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

আল-কুরআন এখানে 'মা'রূফ শব্দ দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের কথা বুঝিয়েছে, যা করার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে। আর 'মুনকার' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে ঐ সকল কাজের কথা, যা করাকে শরীয়ত অবৈধ ঘোষণা দিয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এমন দলের সৃষ্টি হওয়া একান্ত অপরিহার্য যাদের কাজ হবে কুরআন যেসব কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সেই সব কাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং যা কিছু নিষিদ্ধ করেছে তা থেকে মানুষকে বিরত রাখা । সুতরাং, এ আদেশ দ্বারা রাষ্ট্রকে ইসলামী রূপরেখায় রূপায়িত করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা রাষ্ট্র যদি ইসলামী আদর্শের রঙে রঙীন না হয় তাহলে আল-কুরআনের ফৌজদারী ও আদালতী ঘোষণাবলীসহ বহু ঘোষণাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং আল-কুরআন এভাবেই দীন-দুনিয়ার পার্থক্য বিদূরিত করে এ দুয়ের কার্যাবলীর মধ্যে একটি দৃঢ় বন্ধন জুড়ে দেয়।

কুরআন দীন-দুনিয়ার মধ্যে আলাদা আলাদা ঘোষণা দ্বারাও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। আবার কখনো এক স্থানে একটি বিশেষ ঘোষণা দ্বারাও উভয়ের মধ্যে মিলন সেতু সৃষ্টি করে। সুতরাং সত্যের অনুসন্ধানকারী একজন লোক এ ধরনের একটি ঘোষণার দ্বারা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে যে কুরআন কিরূপে ধর্ম, চরিত্র ও পার্থিব কাজ কারবারকে একত্রিত করে এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ -

[হে মুহাম্মদ (সা)!] আপনি বলুন, এস, আমি তা তোমাদের পাঠ করে শোনাই, যা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন; তিনি নিষিদ্ধ করেছেন যে, তোমরা তার সাথে কাউকে অংশী করবে না। তিনি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (তিনি বলেছেন যে) আমি যেমন তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি, তেমনি তাদেরকেও রিযিক দিয়ে থাকি। (আর তিনি বলেছেন) তোমরা খারাপ, অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না—চাই তা প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয় হোক। আর এমন কোন প্রাণীকেও হত্যা করো না, যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। তবে সুবিচারের ক্ষেত্রে তা করতে পার! আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশগুলো এইজন্য দিচ্ছেন যেন তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে পার। —সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১

এটি এমনটি একটি ঘোষণা, যা শিরক, পিতামাতার অবাধ্যতা, হত্যাজনিত অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে হারাম করে থাকে। দীন ও দুনিয়াকে সংমিশ্রিত করার এবং উভয়ের মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত করার উজ্জ্বল

নযীর আর কি থাকতে পারে ? আল-কুরআন দীন- দুনিয়াকে তার মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাকে রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারণ করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

এ লোকেরা এমনই যে, আমি যদি তাদেরকে এ পার্থিব জগতে শাসন ক্ষমতা দান করি, তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অন্যায় কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখবে।

—সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৪১

বস্তুত আল-কুরআনের এ ঘোষণাটি ইসলামী হুকুমতের এমনি একটি চিত্র তুলে ধরে, যা জনসাধারণকে নামায কায়েম ও যাকাত দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর তা-ই হলো রাষ্ট্রীয় সংস্থা। এ রাষ্ট্রীয় সংস্থাটিই আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যা কিছু করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে জনসাধারণকে বিরত রাখবে। এ ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্র ইসলামী হওয়া এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী ইসলামী মূলনীতির উপর সুসম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য প্রমাণিত হয়।

আল-কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াতই বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের আয়াতগুলোতে বিশেষভাবে আভ্যন্তরীণ ফিতনা-ফাসাদ, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ, চুক্তিপত্র এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান ও ব্যক্তিগত অবস্থায় আলোচনা রয়েছে। কুরআন ধনী লোকদের সম্পদের উপর দরিদ্র ও অভাবী লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। বায়তুলমালে ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদেরও অধিকার নির্ণয় করে দিয়েছে। আল-কুরআন পার্থিব কোন বিষয়কেই সমাধান ব্যতীত ছেড়ে দেয়নি। সে ধর্ম ও চরিত্রকে রাষ্ট্রের সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে সাহায্যকারীরূপে পরিণত করেছে এবং শাসক ও শাসিতদের মান-মর্যাদাও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এর পরও কি আর ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে ? এমনিভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র দীনে এবং দীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

দীনের মধ্যে সুন্নতে রসূলের মর্যাদা

এ সব মুসলমান যুবক যারা আল-কুরআনের প্রতি এহেন দৃঢ় ঈমান রেখে থাকে, তারা কুরআনই যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজকে মুসলমানদের জন্য শরীয়তের অপরিহার্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সে ব্যাপারে তারা কোনরূপ জ্ঞান রাখে না। এ ব্যাপারে তারা অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজই শরীয়তের বিধানগত গুরুত্ব বহন করে। আল-কুরআনই মুসলমানদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুকুম-আহকামকেও বাস্তবায়িতকরণ এবং তাঁর আনুগত্যকরণকে ফরয করে দিয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র রসূল নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির তাকিদে কোন কথা বলেন নি, বরং তিনি যা কিছু বলেছেন তা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকেই বলেছেন। যেমন কালাম পাকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -

তিনি প্রবৃত্তির তাগিদে কোন কিছু বলেন না, তিনি যা কিছু বলে থাকেন তা হচ্ছে অবতীর্ণ অহী । —সূরা আন-নজম ঃ ৩-৪

আর রসূলের আনুগত্য এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বহু ঘোষণাই বর্ণিত পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করো, আর আনুগত্য করো তাঁর প্রেরিত রসূলের। —সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

যারা রসূলে আনুগত্য করবে, তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করলো। —সূরা আন-নিসা ঃ ৮০

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভাল বাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন। —সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا –

রসূল যা কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন তা তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। আর যা কিছু নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। —সূরা আল-হাশর ঃ ৭

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

আপনার প্রভুর নামে কসম করে বলছি, তারা তখন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিতর্কিত ব্যাপারে আপনাকে বিচারকরূপে (মীমাংসাকারী) গ্রহণ না করে। আর আপনি যা কিছু মীমাংসা করবেন সে ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ খটকা অনুভব করবে না, বরং তা অবনত মস্তকে মেনে নেবে। —সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا –

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূল হলেন উজ্জ্বল, (কর্মজীবনের) ও উত্তম নমুনা ঐ লোকদের জন্য, উত্তম আদর্শ যারা আল্লাহ্র প্রতি উত্তম আশা পোষণ করে, পরকালের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করে। —সূরা আল-আহযাব ঃ ২১

তাদের দ্বিতীয় উদ্ভট দাবি হলো শরীয়তী বিধান বর্তমান যুগের জন্য উপযুক্ত নয়। এ দাবি উত্থাপনকারী অধিকাংশই হলেন ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা তাদের এ যুক্তির স্বপক্ষে কোন কারণ দর্শায় না। অথবা তারা এ কথা বলে যে, শরীয়তের বিশেষ কোন বিধান বা সমুদয় মৌলিক নীতিমালাই হচ্ছে বর্তমান যুগের জন্য অনুপযুক্ত বিধান। তারা যদি এর

অযোগ্যতার কোন কারণ দর্শাতো তাহলে এ দাবির একটা মূল্য থাকতো এবং যুক্তির দিক দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও খণ্ডন করা যেতো। কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ না দর্শিয়েই তারা বলে যে, শরীয়তের সমগ্র বিধানই আধুনিক যুগে বেকার—অনুপযুক্ত। সুতরাং এদের এ দাবিটি চিন্তাশীলদের জন্য একটি ফাল্‌তু বিষয় বৈ কিছুই নয়। আর আমরা যখন একথা জানতে পারবো যে, এ দাবিগুলোর প্রবক্তা তারা, যারা শরীয়তী বিধান সম্পর্কে আদৌ জ্ঞানই রাখে না, তখন আমাদের জন্য এ অভিমত পোষণ করা কোন দিক দিয়েই অন্যায় হবে না যে, তাদের এ দাবি অজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আসলে আইনের কর্মক্ষমতা তার মৌলিক ধ্যান-ধারণা এবং নীতিমালা যোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং শরীয়তী আইন-কানূনের মধ্যে এমনি ধরনের একটি ভিত্তিমূলও বর্তমান পাওয়া যাবে না, যার অযোগ্যতার দরুন উহাকে বাতিল করা যেতে পারে। আমরা যদি এখানে শরীয়তী বিধানের কিছু আলোচনা করি যার উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহলে আমরা জ্ঞাত হতে পারবো যে, কিছুসংখ্যক মুসলমানের অজ্ঞতা কতদূর গড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

ক. এখানে শরীয়তের সাম্যবাদী নীতির কথা উল্লেখ করছি। শরীয়ত মানুষের মধ্যে সাম্যবাদকে একটি অন্যতম নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এজন্য সে কোন শর্ত-সীমা রাখেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের গোত্রে ও সম্প্রদায়ে এজন্য বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী।

—সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৩

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

الناس سواسية كاسنان للمشط للواحد لافضل لعاربى على اعجمى الا بالتقوى -

একটি মাড়ির দাঁত যেরূপ সমমানের হয়ে থাকে, তেমনি সমগ্র মানুষের মানও সমান। কোন আরবী লোকদের জন্য অনারবী লোকদের উপর কোনরূপ অধিক সম্মান ও মর্যাদাবোধ নেই; তবে সম্মান থাকলে, তা একমাত্র তাকওয়া-পরহেযগারীর গুণেই হতে পারে।

শরীয়ত তার এ বিধানকে আজ হতে সাড়ে তেরশত বছর পূর্বে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর মানব রচিত আইন নিয়ে যারা গর্ববোধ করছে, সে আইন সাম্যবাদী নীতির সাথে শুধু আঠার শতাব্দীর শেষভাগেই পরিচয় লাভ করাতে সক্ষম হয়েছে। তখন থেকেই ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলো এর সীমিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে তাদের গণ্ডীসীমার মধ্যেই বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করে আসছে।

খ. আর শরীয়ত তার নাযিলের দিন থেকেই আযাদী ও স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সে চিন্তা-বিশ্বাসের ও বাকস্বাধীনতার জন্য নীতি-নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেকটি ঘোষণাই আল-কুরআনে বর্তমান পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ -

হে নবী ! আপনি তাদের বলে দিন যে, আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর। —সূরা ইউনুস ঃ ১০১

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত কেউই নসীহত গ্রহণ করে না।

—সূরা বাকারা ঃ ২৬৯

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাম'আত বা দল সৃষ্টি হওয়া উচিত যারা কল্যাণের পথে মানুষকে ডাকবে এবং তাদেরকে সৎ ও ন্যায় কাজ করার জন্য নির্দেশ দেবে ও অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

ইসলামের মানব স্বাধীনতার এ মৌলিক নীতিমালার দিক তিনটি সম্পর্কে মানব রচিত আইন কোন কালেই নজর দিত না। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন কিছু অবগত হলেও তা হচ্ছে ফরাসী বিপ্লবের পর। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এ বিষয়ের কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু মূর্খ ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা এ দর্শনকে শরীয়ত হতে ছিনিয়ে নিয়ে মানব রচিত আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে থাকে।

গ. শরীয়তী বিধান যে সব মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আদালতী ব্যবস্থাপনার ভিত্তিটি হচ্ছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পবিত্র কালামে মজীদের নিম্নলিখিত ভাষ্যটিই এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বিচার ও আপস-মীমাংসা কর তখন তা ন্যায় ও সুবিচারের সাথে কর। —সূরা নিসা ঃ ৫৮

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা পোষণ যেন তোমাদের এমন অন্ধ না বানিয়ে ফেলে যে তোমরা আদল-ইনসাফ ও সুবিচারের পথ পরিহার করে চল। —সূরা মায়িদা ঃ ৮

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ - اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا - فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا -

হে ঈমানদারগণ। ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী হও। এ সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের জন্য, তোমাদের পিতা- মাতা ও নিকট আত্মীয়দের বিপক্ষেও হয়, তবুও সুবিচার হতে দূরে সরে পড়ো না। সে যদি ধনী হয় বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয়ভীতি ও আশা পোষণ করা উত্তম কাজ। প্রবৃত্তির পায়রবী করো না। কেননা, সে তোমাদের সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে নেবে। —সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৫

এ হচ্ছে সেই ভিত্তিমূল, যাকে শরীয়ত তার নাযিলের দিবস হতে নিজের জন্য নিয়ে এসেছে। আর মানব-রচিত আইন আঠার শতাব্দীর শেষ দিকের পূর্বে কখনো এ কথা জানতো না।

এই হলো তিনটি মৌল ভিত্তি, যার উপর বর্তমান মানব-রচিত আইন প্রতিষ্ঠিত। আর শরীয়ত এ আইন-কানূনগুলোর তুলনায় চৌদ্দশো' বছর পূর্বেই এ বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। সুতরাং বলুন তো মানব রচিত আইন-কানূনগুলো যদি বর্তমান যুগের জন্য উপযোগী হয়, তবে শরীয়ত কেন উপযোগী হবে না ? অথচ সেগুলি নীতিমালার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর ইসলামী শরীয়ত প্রথম দিন থেকেই শুরাকে একটি মূলনীতিরূপে নিয়ে এসেছে। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وشاورهم فى الامر- وامرهم شورى بينهم -

তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হয়—তারা নিজেদের সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শ করে থাকে।

আর এ ব্যাপারেও শরীয়ত মানব-রচিত আইনের চৌদ্দশো বছর পূর্বেই যাবতীয় কাজকর্ম ও সমস্যার সমাধান এই মূলনীতির ভিত্তিটির উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু বিধর্মীদের আইন-কানূন শরীয়তের এক হাজার বছর পর ও মূলনীতিটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতারাং শুরা পদ্ধতির নীতিটিকে গ্রহণ করে নেওয়া নতুন কিছু নয়। মূল কথা হচ্ছে যে, শরীয়ত যেখান হতে কাজের সূচনা করেছে, এ মানব-রচিত আইন সেখানে পৌঁছে থেমে গেছে।

শরীয়ত তার আগমনের দিনটি হতেই শাসকদের ক্ষমতা ও ইখতি- য়ারের শর্তাবলী ও সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। সে জনসাধারণের প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল খাদেমরূপে তাদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর জুলুম ও অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাকে দায়িত্বশীল নির্ণয় করেছে। শরীয়তী বিধান শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর লোকদের উপরই প্রযোজ্য। শাসক- গণকে সকল ক্ষমতা ইখতিয়ার ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে শরীয়তের সমগ্র বিধানের পাবন্দ থাকতে হয়। শাসিত জনতার উপর তাদের কোনরূপই মর্যাদা নেই। এ সব কিছু ইসলামী শরীয়তের সাম্যবাদী দর্শনের বাস্তব রূপ নয় কি ?

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের ভিত্তি যে এ মৌলিক ভিত্তিসমূহের উপর রচনা করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা মানব রচিত আইনসমূহ ওয়াকিফহাল হবার এগারশো বছর পূর্বেই এ জগতে আগমন করেছে। সুতরাং এতদসত্ত্বেও কেমন করে এবং

কোন যুক্তি বলে একথা বলা হয় যে, শরীয়তী বিধান বর্তমান যুগের জন্য উপযোগী নয় এবং বর্তমান যুগের সমাজ জীবনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। শরীয়তের বিধান শরাবের নিষিদ্ধতা এবং তালাকের বৈধতা নিয়ে এ জগতে পদার্পণ করেছে। যেমন পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ -

হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে শরাব, জুয়া মূর্তি ও ভাগ্য পরীক্ষার তীর নিক্ষেপ নাপাক বস্তু এবং শয়তানী কাজ। এগুলো বর্জন করে চলো।

—সূরা মায়িদা ঃ ৯০

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ -

তালাক দুবার দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং উত্তম পন্থায় স্ত্রীকে নিজ অধীনে রেখে দাও অথবা সুন্দরভাবে তাদের পরিত্যাগ করো।

—সূরা বাকারা ঃ ২২৯

মানব রচিত আইনসমূহ শরাবের নিষিদ্ধতা এবং তালাকের বৈধতা সম্পর্কে শুধু কেবল এ শতাব্দীতেই ওয়াকিফহাল হতে পেরেছে। এ শতাব্দীর পূর্বেই তার কাছে এ বিষয় কোন কথাই বর্তমান ছিল না। এসব আইনের মধ্যে কতিপয় আইনে শরাবকে সাধারণরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম বলে নিরূপণ করা হয়েছে। আর কতিপয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আংশিকভাবে। আর তালাকের বেলায় তার কতিপয় আইন সাধারণ ও শর্তহীনভাবে। ঘোষণা দিয়েছে; আর কতিপয় আইনে তাকে করে দেওয়া হয়েছে শর্তাধীন। সুতরাং যে আইনসমূহ শরীয়ত থেকে নেওয়া হয়েছে, তা কিরূপে বর্তমান যুগের জন্য উপযোগী প্রমাণিত হলো এবং শরীয়ত বা কিরূপে অনুপযোগী সাব্যস্ত হলো ?

সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার দর্শন পেশ করার বেলায় ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে কৃতিত্বের দাবিদার। তার পূর্বে দুনিয়ার কোন মতবাদ ও আইন-কানূন এ দর্শন পেশ করতে সক্ষম হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা কালামে মজীদে ইরশাদ করেন ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

সৎ-পুণ্যশীলদের ও আল্লাহ-ভীরুতার কাজে একে অপরকে সাহায্য-সহানুভূতি করো। আর অসৎ ও জুলুমবাজির কাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি থেকে বিরত থাকো। —সূরা আল-মায়িদা ঃ ২

وَالَّذِيْنَ فِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

এরা হচ্ছে সেই লোক যাদের ধন-সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য নির্ধারিত হক রয়েছে। —সূরা আল-মা'আরিজ ঃ ২৪-২৫

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها -

তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকা হিসাবে কিছু অংশ নিয়ে নিন, এর দ্বারা তাদেরকে পাক, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন।

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

সদকা (যাকাতের) প্রাপকের আসল খাত হলো—ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, অন্তর জয়করণ, দাসমুক্তি, ঋণ আদায় এবং আল্লাহর রাস্তায় ও মুসাফিরদের জন্য। এ খাতগুলো আল্লাহর তরফ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও মহা বৈজ্ঞানিক।—সূরা তাওবা ঃ ৬০

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

আল্লাহ তা'আলা গনীমতরূপে যা কিছু তাঁর রসূলকে বস্তিবাসীদের থেকে দান করেছেন, তা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের জন্য; আর রসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য; এ ব্যবস্থা এ জন্য নেওয়া হলো যেন ধন-সম্পদ ধনীদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে না থাকে।—সূরা আল-হাশরঃ ৭

ইসলামী শরীয়ত তার এ দর্শন দু'টোকে সাড়ে তেরশ বছর পূর্বেই মানব সমাজে প্রচলিত করেছে। ইসলামী দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশের লোকেরা একে শুধু বর্তমান শতাব্দীতেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত সীমারেখা পর্যন্ত এর বাস্তব রূপায়ণ করতে পেরেছে। শরীয়তী বিধান সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনিভাবে মানব জীবনের দৈনন্দিন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর বাজার দর কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে দেওয়াকেও হারাম ঘোষণা করেছে। আর হারাম করেছে ঘুষ প্রথাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—গুনাহরগার লোক ব্যতীত অপর কেউই সম্পদ কেন্দ্রীভূত বা আটকে রাখে না। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

তোমরা বাতিল পন্থায় একে অপরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং তা হাকিমের নিকট এ জন্য পৌঁছিও না যে তোমরা তোমাদের জ্ঞাতসারে মানুষের ধন-সম্পদের একটি অংশ গুনাহর সাথে ভক্ষণ করবে।

—সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৮

এগুলো হচ্ছে সেই মৌলিক দর্শন, যেগুলোকে মানব রচিত আইনসমূহ দীর্ঘ দিন পর উপলব্ধি করতে পেরেছে।

শরীয়তী বিধান প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা নিষিদ্ধ- করণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এমনিভাবে গুনাহর কাজ ও অন্যয়ভাবে বিদ্রোহ করাকেও সে হারাম ঘোষণা করেছে। আর এ নিষেধ আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, আমরা পরওয়ারদিগার প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা, গুনাহর কাজকেও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। —সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩৩

শরীয়ত সৎ ও ন্যায় কাজের আদেশ এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের নিষেধকরণের উপর শাশ্বতরূপে প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামা'আত সৃষ্টি হওয়া চাই, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবে এবং সৎ ও ন্যায় কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে।

—সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৪

এই হচ্ছে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা—এর উপরই তা সুপ্রতিষ্ঠিত। এটা এমন ধ্যান-ধারণা, এমন আদর্শ যার আলোকে মানুষ তাদের জীবন গঠন করতে পারে এবং এর দ্বারা মানবতার মুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। সুতরাং এসব মৌলিক আদর্শ ও নীতিমালার মধ্যে এর কর্মচরিত্রটি যখন উজ্জ্বল ভাস্করের ন্যায় দেদীপ্যমান, তখন 'শরীয়ত বর্তমান যুগের অনুপযোগী হওয়া, কথাটার সততা থাকে কোথায় ? আর কিরূপেই বা তা সম্ভব হতে পারে ? বর্তমান যুগের মানুষ যে সমাজ ও আইনগত ভিত্তি নিয়ে গৌরব করে সেই মানবিক সমাজ ও আইনগত ভিত্তিসমূহ যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তবে এক এক করে সবগুলোই শরীয়তের মধ্যে বর্তমান দেখতে পাই। প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় এর বর্ণনা থেকে বিরত রইলাম।

আমাদের এ নাতিদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা ইহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হলো যে, শরীয়তের অযোগ্যতার দাবিটি শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই। অবশ্য এ দাবি উত্থাপনকারী সুধীমণ্ডলী একমাত্র যে বিষয়টিকে উযর হিসারে পেশ করতে পারেন তা হচ্ছে তাঁরা এমন এ শিক্ষা লাভ করেছেন যা প্রাচীন মানব রচিত আইনের পুরানো পচা কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে বর্তমান যুগের আইনবিদ ও যুক্তিবাদিগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং এর দ্বারা তারা একটি সাধারণ নীতি গ্রহণ করে নিয়েছে যে, প্রত্যেকটি প্রাচীন আইন-কানূনই পরিত্যাজ্য। শরীয়ত যেহেতু প্রচীন ও আদিম জীবন বিধান, এজন্য তাকেও বর্জন

করা উচিত। আফসোস যে,তারা মানব রচিত আইন ও শরীয়তের মধ্যকার উল্লিখিত পার্থক্যকে ভালরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণাও করেনি ।

৩. শরিয়তের কতিপয় বিধান বিশেষ সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবার ধারণা

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোক তো শরীয়তী বিধান বর্তমান যুগেও মানুষের ফল প্রসূ হতে পারে বলে ধারণা রাখেন । কিন্তু কতিপয় বিধানকে সমসায়িক ও বিশেষ সময়ের প্রয়োজন ও দাবি মিটানোর জন্যই নাযিল হয়েছে বলে তারা ধারণা করেন । এর দ্বারা তারা শরীয়তের কতিপয় ফৌজদারী বিধানকেই বুঝিয়ে থাকেন । বিশেষ করে সেইসব কঠোর শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়ে থাকে, যার উদাহরণ মানব রচিত আইনসমূহের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা ও হাত কাটার বিধান।

তাদের নিকট এর প্রমাণ একমাত্র ধারণা ছাড়া কিছুই নেই। আর ধারণার দ্বারা যে মূল সত্যকে বর্জন করা যায় না, তা সকলেরই জানা কথা। আসল কথা হলো, এরা মানব রচিত আইনসমূহের মধ্যে এ সব শাস্তি বিধানের ন্যায় কোন শাস্তির বিধান খুঁজে পায় না। আর এর ফলেই তারা এ উদ্ভট দাবি উত্থাপন করে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে থাকে। যদি মানব রচিত আইন শরীয়তের শাস্তি বিধানগুলো গ্রহণ করে নেয়, তবে এ লোকেরাও তাদের ধারণা পালটিয়ে চিৎকার করে বলে উঠবে যে, শরীয়তী বিধান নিঃসন্দেহে শাশ্বত।

এ মুসলমানগণ ইসলামের যেইরূপ চরিত্রটি রয়েছে ঠিক সেইরূপে যদি তাকে বুঝবার চেষ্টা করতো তবে এমন কথা তাদের মুখে উচ্চারিত হতো না। কেননা ইসলামের বিধান চিরন্তন ও সর্বক্ষণের জন্য সমসাময়িক, বিশেষ সময়ের জন্য নয়। যেই বিধান হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পূর্বে বাতিল হয়নি তা কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবে না। আল-কুরআন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পূর্বে এ কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, দীনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। এখন আর তার মধ্যে কম-বেশি হবার আদৌ অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা কালাম পাকে ইরশাদ করেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا –

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন-বিধান পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতের ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিলাম। আর তোমাদের জন্য জীবন-বিধানরূপে ইসলামকে করলাম মনোনীত।

—সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩

এ সব মুসলমান কি এতটুকুও বুঝে না যে, শরীয়তী বিধান বিশেষ সময়ের জন্য, বা সমসাময়িক হওয়া যদি কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে বৈধ হত, তবে তা অন্যান্য বিধান ও আইনের বেলায়ও বৈধ হত ? আর যদি প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের ইচ্ছা ও মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হত, তবে ইসলামের নামগন্ধও অবশিষ্ট থাকত না ?

৪. কতিপয় শরীয়তী বিধান বর্তমান অবস্থায় প্রযোজ্য না হওয়ার দাবি

এ দাবির প্রবক্তাগণ তাদের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মূলত আলাদা। শরীয়তী বিধান যে চিরন্তন তা তারা সমর্থন করে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে তারা এটাও ভেবে থাকে যে, শরীয়তের কতিপয় বিধান যেমন চুরির অপরাধে হাত কাটা ও যৌন অপরাধে পাথর মেরে হত্যা করা ইত্যাদি শাস্তির বিধান বর্তমানে অযোগ্য। কেননা ইসলামী দেশগুলো বর্তমানে খুব দুর্বল এবং তাদের মধ্যে এমন বহু অমুসলিম লোক বসতি স্থাপন করে আছে যারা এমন কঠোরতম শাস্তি বিধানের প্রয়োগকে গ্রহণ করে নিতে আদৌ প্রস্তুত নয়।

এ অভিমতের প্রবক্তাগণ শরীয়তী বিধানের প্রয়োগ শুধু এ জন্য অসম্ভব মনে করে যে, হয়ত অমুসলিম দেশগুলো তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে। কিন্তু এ অভিমত সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী। কেননা পবিত্র কালাম মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ –

মানুষকে ভয় করো না, আল্লাহকে ভয় করো, আর আমার আয়াতকে অল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান মাফিক মীমাংসা করে না, তারা কাফির। —সূরা আল-মায়িদা ঃ ৪৪

এহেন অভিমতের প্রবক্তাগণকে আমরা বলে দিতে চাই যে, অধিকাংশ ফিকহ শাস্ত্রবিদ অমুসলিমরা চুরি ও যৌন অপকর্মের অপরাধে অপরাধী হলে, এ শাস্তি বিধান তাদের জন্য অপরিহার্য মনে করেন না। সুতরাং এ সকল ফিকহ শাস্ত্রবিদের অভিমত গ্রহণ না করার কোনই হেতু থাকতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে আমরা বলে দিতে চাই যে, পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তি একটি ভয়ানক ও বিভীষিকাময় নিদর্শনরূপে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা যৌন অপকর্মের অপরাধ প্রমাণিত হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তি প্রযোজ্য হয়েছে সে সব অপরাধ ও অপরাধীদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই প্রয়োগ করা হয়েছে, সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে নায়। আর সাক্ষীর ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, চারজন সত্যাবাদী পুরুষকে যৌন অপকর্ম করার সময় স্বচক্ষে ঘটনা অবলোকন করতে হবে। আর ইহার সম্ভাবনা যে খুবই কম তা সুস্পষ্ট। বর্তমান যুগে কাহারো ঈমান এহেন অপরাধের স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য যে অপরাধীকে অনুপ্রাণিত করবে তা-ও খুব বিরল, বলতে গেলে আদৌ হয়ই না।

৫. ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র আসলে শাস্ত্রবিদদের অভিমতের দ্বিতীয় নাম

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোক এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র অধিকাংশ অবস্থায় ফিকহ শাস্ত্রবিদদের স্বভাবগত প্রবণতার বাস্তব অভিব্যক্তি। অথবা অন্য কথায় ইহা তাঁদের মন-মগজপ্রসূত শাস্ত্র। আর তাঁদের সামনে যদি কোন লোক ইসলামী আইনের এমন কোন দর্শনকে তুলে ধরে যা মানবীয় আইনবিদগণ বহু যুগ-যুগান্তর পরে অবগত হতে পেরেছে, তখন তারা বিস্মিত হয়ে যায়। যেই দর্শনকে মানবীয় আইনবিদগণ উনবিংশ শতাব্দীতে উপলব্ধি করতে পেরেছে, ইসলামী আইনবিদগণ সেগুলোকে সাত-আট শতাব্দী পূর্বে কিরূপে পেশ করতে পারলো ? সুতরাং এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একজন

ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে, তাঁর মতে ফিকহী মাযহাবের নেতৃবর্গ মানব নন—মানবের উপরে অন্য কোন সৃষ্টি। কেননা তাঁরা নিজেদের চিন্তাশক্তির দ্বারা মানব চিন্তাধারার তেরশ বছর পূর্বেই এসব বিষয় জ্ঞাত হয়েছেন।

"ইসলামী আইন শাস্ত্র ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের আবিষ্কৃত শাস্ত্র"—এ অভিমতটি যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত অভিমত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর যারা একথা বলে থাকে যে, চিন্তাধারার দিক দিয়ে তাদের পদমর্যাদা মানুষের অনেক উচ্চে, তাও সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের মধ্যে উন্নত বোধজ্ঞান ও গভীরতম চিন্তাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো নিজ পক্ষ হতে কোন কিছু আশা করেন নি। আর তাঁরা অতিমানবও নন। আসল কথা হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের সম্মুখে এমন একটি জীবন-বিধান দেখতে পেতেন, যা দর্শন ও মৌলিক নীতিমালার সম্পদে ভরপুর। সুতরাং তাঁরা কেবল এই সকল মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা দান করতেন এবং দর্শন নিয়ে বিশদ আলোচনা করতেন! তাঁরা একজন আইনবিদ ও একজন চিন্তাবিদের করণীয় কাজের চেয়ে বেশি কিছুই করতেন না। এ সুধীগণ একটি দর্শনের অধীনে প্রতিটি বিষয় সন্নিবেশিত করেন, যা তার গণ্ডীসীমার মধ্যে পড়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি মৌলিক নীতিমালার অধীনে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলোকেই কেবল লিপিবদ্ধ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। শরীয়ত এমন একটি শাস্ত্র, যা মানব চিন্তার দিগন্ত হতে অনেক অনেক অগ্রসরমান এবং মহান ও উন্নত দর্শন নিয়ে সে মানুষের কাছে এজন্য আগমন করেছে, যেন মানুষ মহত্তের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে এবং তাদের সে মানবতার সর্বোন্নত মানদণ্ডের উপরে নিয়ে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

সুতরাং বোঝা গেল যে, ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ সাম্যবাদী দর্শনকে নিজেদের থেকে আবিষ্কার করেন নি—আবিষ্কার করেন নি তাঁরা মহান স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণা ও পূর্ণাঙ্গ সুবিচারের দর্শন। বরং এগুলোকে তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর সেই সকল ঘোষণা দ্বারা অবহিত হয়েছেন যা এসব দর্শনের ধারক ও বাহক। এই ঘোষণাবলীর আলোচনা ইতিপূর্বে আমি আপনাদের কাছে করেছি। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ নিজেরা যেমন 'শূরায়ী' দর্শনের আবিষ্কারক নন, তেমনি নন শাসকবৃন্দের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সীমিত ও শর্তায়িতকরণ দর্শনের উদগাতা।

আর শাসকগণ যে আসলে জাতির প্রতিনিধি এবং তাঁদের নিজেদের জাতির কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাদের এ পদমর্যাদাকেও তাঁরা নিজ পক্ষ হতে ঘোষণা দেন নি। তাঁরা শরাবের নিষেধাজ্ঞা ও তালাকের বৈধতার দর্শনকেও নিজেদের থেকে উত্থাপন করেন নি। এসব দর্শনকে তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণা দ্বারাই জ্ঞাত হতে পেরেছেন। আর এমনিভাবে ঋণদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ লিখিত হওয়ার অপরিহার্যতাকেও নিজদের পক্ষ থেকে তাঁরা অবশ্য করণীয় কাজ নির্ধারণ করেন নি। তা আল-কুরআনের ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ الى قوله... وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ - الى قوله... اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا -

> হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা পরস্পর একটি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত লেন-দেন ও ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তোমরা তা লিখে রাখো।... আর নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কোন আদান-প্রদানের সময় ছোট হোক বা বড় হোক তা লিখে রাখতে অলসতা করো না।... হ্যাঁ, তবে তোমাদের ব্যাপার যদি এমন হয় যে তা উপস্থিত হাতে হাতে বা নগদ নগদ ব্যবসায়ী আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়,তবে তা লিখে না রাখায় কোন ক্ষতির কারণ নাই। —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮২

এমনিভাবে ইসলামী আইনবীদগণ (ক্রয়- বিক্রয়ের) সেই শর্তাবলীকে যার পক্ষ হতে দাবি হবে তাকে বাক্য বিন্যাসসহ পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দিবার বিধানটিও নিজদের ইচ্ছামত পেশ করেন নি। বরং ইহা সব কিছুই আল-কুরআনের কণ্ঠ হতে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْــًٔا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ -

আর বিষয়টি বাক্যবিন্যাসসহ সেই ব্যক্তিরই বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, যার উপর দাবি থাকবে। আর এ ব্যাপারে তার প্রভু আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। আর যার প্রতি দাবি রয়েছে সে যদি অজ্ঞ ও মূর্খ হয় বা এমন দুর্বল হয় যে, বাক্যবিন্যাসসহ সে বুঝিয়ে দিতে অক্ষম, তখন তার অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষকগণের ন্যায় ও সুবিচারের সাথে বিষয়টি বাক্যবিন্যাসসহ বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮২

এছাড়া ইসলামী আইনবিদরা সেই দর্শনটিকেও অনাহূত নিজ পক্ষ থেকে আবিষ্কার করেন নি, যেটিকে আইনের পরিভাষায় 'পাত্রের বিবর্তনতার' দর্শন বলা হয়ে থাকে। বরং এ দর্শনাটিকে তাঁরা আল-কুরআনের ঘোষণা হতেই গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا –

কোন লোকের উপর আল্লাহ তা'আলা তার শক্তি-সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দেয় না। —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৬

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ –

দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা রাখেন নি। —সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৮

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ –

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বস্তুগুলো বিবরণ বিশদরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে তোমরা যদি বাধ্য-বাধকতার মধ্যে নিপতিত হও তখন কিছু সময়ের জন্য হারাম বস্তুও হালাল হয়ে যায়।

—সূরা আল-আন'আম ঃ ১১৯

আর ইসলামী আইনবিদগণ জুলুম-অত্যাচার ও অপারগতার এবং বাধ্য-বাধকতার সময়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার দর্শনটিকেও নিজেদের থেকে রচনা করে পেশ করেন নি, বরং শরীয়তই এ দর্শনটির উদ্গাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ –

কিন্তু যদি কাকেও বাধ্য করা হয়, তখন কুফরী কালাম মুখে উচ্চারণ করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো যে, তার অন্তকরণ ঈমানের প্রতি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকতে হবে। —সূরা নাহল ঃ ৭৮

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ –

যদি কোন লোকের প্রয়োজন হয়, তখন তার জন্য নিষিদ্ধ বস্তুও বৈধ হয়ে যায়, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, সে আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি বিদ্রোহী ও সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৩

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رفع عن امتى الخطاء و النسيان وما استكرهوا عليه –

আমার উম্মতের থেকে গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর যদি কোন লোককে কোন গুনাহর কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়, তবে সে গুনাহকেও মার্জনা করে দেওয়া হয়েছে।

আর ইসলামী আইনবিদগণ অল্পবয়স্ক, মাতাল, পাগল ও নিদ্রিত ব্যক্তির শাস্তিকে ক্ষমা করার দর্শনকেও নিজ তরফ হতে উল্লেখ করেন নি। বরং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যবান হতেই তা ঘোষিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

رفع القلم عن ثلاث – عن الصبى حتى يحتلم و عن النائم حتى يصبحوا وعن المجنون حتى يفيق –

তিন শ্রেণীর লোকদের বেলায় কলম উঠিয়ে নিয়ে ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে—১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক—বালেগ হওয়া পর্যন্ত। ২. নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। ৩. পাগল ও মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি—সুস্থ ও জ্ঞানবান হওয়া পর্যন্ত।

আর শাস্তির পাত্র অপরিহার্যরূপে তার কর্তাই নির্ধারিত হবার দর্শনটি ইসলামী আইনবিদদের মনগড়া কোন কাজ নয়। বরং আল্লাহ্‌র ঘোষণাই হচ্ছে এর মূল উৎস, যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى -

কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির গুনাহের বোঝা বহন করবে না।

—সূরা আন'আম ঃ ১৬৪

এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা হচ্ছে এই ঃ

لا يواخذ الرجل بجريدة ابيه ولا بجريدة اخيه -

কোন লোককে তার পিতা বা ভাই-বেরাদারের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ যামদাহ (রা) এবং তাঁর ছেলেকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

انه لا يجنى عليه ولا تجنى عليه -

সে তোমার কৃতকার্যের ফল ভোগ করবে না, আর তোমাকে তার কৃতকার্যের শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

এছাড়া ইসলামী আইনবিদগণ স্বেচ্ছাকৃত বিধান ও ভুলবশত বিধানের মধ্যেও নিজেরা কোনরূপ পার্থক্য করেন নি, বরং আল-কুরআন নিজেই এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে ঘোষণা দিয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ... الخ -

কোন মু'মিন নর-নারীর জন্য অপর কোন মু'মিন নর-নারীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা বৈধ নয়; যারা ভুলবশত কোন মু'মিন নর-নারীকে হত্যা করবে তাদের জন্য শাস্তি বিধান হলো একটি মু'মিন গোলাম মুক্ত করে দেওয়া এবং তার পরিবার-পরিজনদের জন্য জরিমানা (দীয়ত) দেওয়া।

—সূরা আন-নিসা ঃ ৯২

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহত ব্যক্তির বেলায় কিসাস ফরয করে দেওয়া হয়েছে। —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৮

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ –

সেই সকল কাজের ব্যাপারে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না, যেগুলো তোমরা ভুলবশত করে থাকে। বরং তোমরা যা কিছু আন্তরিক ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কর, কেবল সেই ব্যাপারেই তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে। —সূরা আল-আহযাব ঃ ৫

ইসলামী আইন শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে এমন কোন দর্শন ও সাধারণ মৌলিক নীতি পরিলক্ষিত হবে না, যেগুলো সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর ভিতর কোন না কোন ঘোষণা নাযিল হয়নি। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদরা এ ব্যাপারে শুধু দর্শন ও মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই করেন নি। তাঁরা প্রত্যেকটি দর্শন ও মৌলিক নীতিমালার প্রয়োগিক শর্তাবলীকে সুন্দররূপে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে তুলে ধরেছেন এবং ঐ সকল দর্শন ও নীতিমালার অধীনে যে সব বিষয় এসে থাকে তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সর্বদাই নিজেদেরকে কুরআন-সুন্নাহর আয়ত্তাধীনে রেখেছেন এবং সর্বদা সাধারণ মৌলিক নীতিমালার ও তার আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে রেখেই কাজ করে গিয়েছেন।

এছাড়া ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ এইসব নীতিমালার আলোকে যা কিছু করেছেন এবং যে জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেদের শরীরকে ক্লান্ত করে তুলেছেন, তা হচ্ছে শাখা-প্রশাখা ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোকে ঐসব নীতিমালার সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ঐসব নীতিমালার আলোকে যে সব বিধান বের হয়ে থাকে সেগুলোর বিশদ বিবরণ দেওয়া। কেননা শরীয়তী বিধান এমন বিশদ ঘোষণা নিয়ে আগমন করেনি যে, প্রত্যেকটি অবস্থায়ই শাখা-প্রশাখা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের ব্যাপারে বিধান জারি করবে।

"ইসলামী আইনশাস্ত্র তার শাস্ত্রবিদগণের স্বভাবগত উদ্ভাবনী বিষয়" এই হচ্ছে সেই দাবির আসল মর্মকথা। এ দাবির ধারক ও বাহকগণ খুব সম্ভব ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়েছেন। কেননা তাঁরা শরীয়তী আইনকে মানব

রচিত আইনের উপর কিয়াস ও ধারণা করে নিয়েছেন। কারণ প্রত্যেকটি মানব রচিত আইন প্রয়োগকৃত আইনের রূপরেখা গ্রহণের পূর্বে তা আইনবিদদের চিন্তাশক্তির ফসলে পরিণত হয়ে থাকে।

এ সুধীমণ্ডলী যদি জাহিরী ফিকহর কিছু কিছু বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা করতেন, তবে তাদের নিকট আসল তাত্ত্বিক বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। কেননা জাহিরী ফিকহর ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা ব্যতীত চতুর্থ কোন উৎসমূলকে স্বীকার করেন না। এ কারণেই তাঁরা কিয়াসকে যেমন দলীলরূপে স্বীকার করেন না, তেমন কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিমতকেও পসন্দ করেন না। তাঁরা মূরসাল হাদীসকেও গ্রহণ করেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা এ ব্যাপারে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন যে, সমুদয় বিধান এবং উহার মৌলিক দর্শন ও নীতিসমূহের জন্য কুরআন-সুন্নাহর নিরঙ্কুশ ঘোষণা পেশ করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি এই একটি বিষয়ের মধ্যেই এ সব সুধীমণ্ডলীর সন্দেহ ভ নের যথেষ্ট মাল-মসলা রয়েছে,যা তাদেরকে ইসলামী আইনের ব্যাপারে কঠোর ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলেছে।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী

এ শ্রেণীর মধ্যে ইসলামের উচ্চ শিক্ষায় তালিমপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদগণও রয়েছেন ও তাঁদের তুলনায় কম শিক্ষিত লোকও রয়েছেন।

এ শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়,যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের সংখ্যার তুলনায় কম।

সাধারণ মুসলমানদের উপর এ শ্রেণীর লোকদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে কেননা মুসলিম জনসাধারণ এদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করে থাকে যে, এরা শুধু ইসলামের সাথেই জড়িত থাকে। কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরা হুকুমত ও রাষ্ট্র এবং জীবনের বৈষয়িক বিষয়সমূহের বেলায় কোনরূপ ইখতিয়ার ও ক্ষমতা রাখে না। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক সভা-সমিতি, ওয়াজ-নসীহত, মসজিদে ইমামতি এবং মাদ্‌রাসা-মক্‌তবে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

আর কিছুসংখ্যক লোক অলংকৃত করে বসে আছেন কাযীর মসনদ। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার শুধু ব্যক্তিগত বিষয়াবলী বা (personal law) এর মুকদ্দমাগুলোর ফয়সালা দান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

ইসলামী দেশসমূহে ইউরোপীয় আইন-কানূন প্রবেশ করার পূর্বে এ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বেশ শক্তি ও ক্ষমতা বর্তমান ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় আইন-কানূনের প্রবেশের পর উদ্ভূত নবতর অবস্থা ও পরিবেশ এ শ্রেণীর লোকদেরকে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা রহিত হয়ে যেতে লাগলো। পরিশেষে তাদের থেকে তাদের সমুদয় ক্ষমতা, শক্তি ও ইখতিয়ারকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। এ অবস্থায় সুদীর্ঘ একটি কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। এমন কি এ শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক নবতর পরিবেশ ও আইনের সাথে বন্ধুত্ব ও মিতালী করে নিয়ে তার থেকে স্বার্থ উদ্ধার করতে লেগে গেল। আর অধিকাংশ লোকই এ ব্যবস্থায় নিশ্চুপ থাকাকেই উত্তম মনে করলো। এ অবস্থাটিকে তারা উদারচিত্তে গ্রহণ করে নিতে পারলো না। বরং তার সম্মুখে দুর্বল অপারগ ও নাচার হয়ে যাবার কারণেই এ অবস্থাকে নিশ্চুপ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এরা হচ্ছে সেই শ্রেণীর লোক যারা নিজেদেরকে, আর সাধারণ মুসলমান তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরশীল মনে করে থাকে। কেননা এরা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় ইসলামী বিধান সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল। আর এ শ্রেণীর লোকই ইসলামের পক্ষ হতে প্রতিরক্ষার অধিক ক্ষমতার দাবিদার; যদিও কতিপয় লোকের মনোভাব হচ্ছে যে, নৈসর্গিক অবস্থা ও দিকচক্রবালের চলমান গতিধারার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে একাধিকবার অকৃতকার্য হয়েছে। আর এটাই ছিল তাদের সেই দুর্বলতা, যার কারণে ইউরোপীয় আইন-কানূনগুলো মুসলিম দেশসমূহে অনুপ্রবেশ করেছে এবং সেখানে দৃঢ়রূপে শিকড় গজাবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। অতঃপর সেখানে ইসলামী শরীয়তের কার্যকরী ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। সেখানে এই অবস্থা দেখা দিল যে, একটি বংশ

শেষ হয়ে যাবার পর সেখানে অপর এমন একটি বংশের আগমন হলো যারা গুটিকয়েক ইবাদতী আচার-অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত বিষয় ব্যতীত শরীয়ত সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখে না। এমন কি জাহিল গণ্ড মূর্খ লোকেরা ভাবতে লাগল যে, বর্তমান অবস্থায় তাদের উপর যে সব আইন-কানূন জারি করা হচ্ছে, তা ইসলামেরই বিধান অথবা কমপক্ষে তা এমনই আইন, ইসলাম যার বিরোধিতা করে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা এ ধারণা মনে বদ্ধমূল করে বসে আছে যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্ম, রাষ্ট্রের সাথে তার আদৌ কোন সম্পর্কই নেই। অথবা তা এমনি একটি অসম্পূর্ণ মতবাদ যার মধ্যে মানবজীবনের সমস্যার সমাধান পেশ করার কোন ক্ষমতাই নেই। এ ছাড়া তারা এই ভুল বুঝে নিয়েছে যে, ইসলামের আলিমদের মতেও ইসলাম দেশীয় আইন-কানূনের কোনরূপ বিরোধিতা করে না এবং সে মুসলিম শাসকগণকে তাদের সামাজিক সমস্যাবলী যে কোন মানব রচিত আইন-কানূন মাফিক পরিচালিত করার অধিকার দান করে থাকে! এর কারণ হলো যে, উলামায়ে ইসলাম প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতে গিয়ে একবার বা কয়েকবারই পরাজয় বরণ করে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি শেষ সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এটা তাদের জন্য কোন দোষের কথা নয়। দোষ ও অপরাধ কেবল তখনই হতে পারে, যদি তারা ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের সম্ভাব্য শক্তি ও সময় ব্যয় না করতো। আসল ব্যাপারটি অন্যরূপ-তারা নিজেদের সর্বশক্তি ও সময় এ পথে ব্যয় করেছেন বটে কিন্তু অবস্থা ও পাত্র তাদের অনুকূলে ছিল না, ফলে তারা সাফল্যের দ্বারদেশে উপনীত হতে পারেনি। আর এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, তারা বর্তমানে তাদের সর্বশক্তি ক্রমাগত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করে রেখেছে এবং মনে-প্রাণে এ আশাই পোষণ করছে যে, পরিশেষে তাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌র মদদ অবশ্যই আসবে।

এ সময় ইসলামী দেশগুলোতে ইসলামের উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যা মনে-প্রাণে দৃঢ় আশা পোষণ করছে যে, ইসলাম থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাকে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তারা আল্লাহ্‌র পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে আদৌ ভয় করে চলে না। কিন্তু এ

দলটি সর্বদিক দিয়ে এখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। কোন কোন দিক দিয়ে এখনও এরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের থেকে একটি সীমারেখা পর্যন্ত এগিয়ে আছে। কেননা এরা নিজেদের কর্ম প্রচেষ্টাকে অধিকতর নফল ইবাদত-বন্দেগী ও ওয়াজ-নসীহতের কাজে ব্যয় করছে।

অথচ এরা যদি তাদের অধিকাংশ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম শরীয়তকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যয় করত এবং শরীয়তের পরিপন্থী আইন-কানূনগুলোকে চিহ্নিত করে দিয়ে তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী বিধানকে তুলে ধরত, তবে এ পথে তাদের শত্রু ও বাধা-বিপত্তি বর্তমান থাকলেও কোন ক্ষতির আশংকা ছিল না। যেহেতু ইসলামী দেশগুলোতে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, সেহেতু মুসলিম জনসাধারণের অধিকাংশকে যদি একটি বিশেষ চিন্তাধারার ছাঁদে ঢালাই করে সাজিয়ে সংগঠিত করা হয়, তবে এ চিন্তাধারাটিই কিছু দিন পর এমন একটি মূলভিত্তিতে রূপায়িত হতে পারে, যাকে জীবনে সর্বস্তরে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠিত করা খুবই সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, এ নবতর জামা'আতটি শরীয়ত ও দীনের পানে মানুষকে দাওয়াত দানের বেলায় এমন একটি কর্মপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যা সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হলেও শিক্ষিত শ্রেণী তার প্রতি পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেনি। অথচ এ শ্রেণীটিই জীবনের সাধারণ কাজ-কারবারের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রভাবশালী হয়ে আছে এবং তাদের হাতেই রয়েছে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরীকরণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূল চাবিকাঠি। সুতরাং প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, 'উলামায়ে দীন তাদের পূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টাকে এ লোকদের মন-মগজে ইসলামী বিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার কাজে ব্যয় করেন। এরা যদি ইসলামের আসল রূপরেখা ও কর্মচরিত্রটিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে, তবে এরাই ইসলামের সর্বোত্তম নিরলস কর্মী ও খাঁটি মুজাহিদরূপে প্রমাণিত হতে পারে।

'উলামায়ে ইসলামের সমীপে আমার দৃঢ় আশা হচ্ছে যে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুধীমণ্ডলীর সামনে ইউরোপীয় আইন এবং শরীয়তী বিধানের বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্যকে পরিষ্কাররূপে তুলে ধরবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

সুধীমণ্ডলী ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের যে মূলতত্ত্বের বেলায় তারা অজ্ঞ, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান রয়েছে। আর 'উলামায়ে কিরামের খিদমতে আমার ঐকান্তিক নিবেদন হচ্ছে যে, তারা যেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী লোকদের জন্য শরীয়তের তালিম ও শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক ও গ্রহণ উপযোগী করে পেশ করেন এবং উহার দর্শন ও মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। আর মানব রচিত আইনের উপর যেন শরীয়তী বিধানের মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্বকে তাদের নিকট পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেন। 'উলামার জন্য এ কাজ করা খুবই সহজ।

আর তাঁরা এমন একটি ইসলামী শিক্ষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, যে প্রতিষ্ঠানটি হবে বিভিন্ন মাযহাবের 'উলামায়ে কিরামদের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে প্রত্যেক মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ সংগৃহীত হবে, তাঁর সাহায্যে আধুনিক বাচনিক পদ্ধতিতে যুগের বর্তমান দাবি মাফিক একটি সঙ্কলন রচনা করবেন। আর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়বস্তুকে পুনর্বিন্যাস ও সুশৃঙ্খলরূপে সংগঠিত করে আধুনিক ধরনের বিষয়সূচীর তালিকা প্রণয়নেরও কাজ করবে। আর এর দ্বারা ইহাও করা যেতে পারে যে, আধুনিক বিন্যাসপদ্ধতি ও বাচনিক পদ্ধতিতে ইসলামী আইন শাস্ত্রে যেখানে বিভিন্ন মাযহাবকে একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে দেখান হয়েছে—তা আলাদা আলাদাভাবে কয়েকটি পুস্তকে প্রকাশ করা। যেমন ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে একটি পুস্তক, কেরায়া ও ইজারাদারী সম্পর্কে একটি, অংশীদারী ও সমবায় ভিত্তিক কাজ-কারবার সম্পর্কীয় একটি পুস্তক। এমনিভাবে অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করা।

'উলামায়ে ইসলামের খিদমতে আমার এ আশাও বলো যে, তাঁরা যেন আইন-সভা ও বিধান সভার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সামনে শরীয়ত বিরোধী আইনসমূহের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্তকে পেশ করেন এবং শরীয়তী বিধানকে কিরূপে ও কি কর্মধারায় বাস্তবায়িত করা যায় তাও যেন তাদেরকে বলে দেন। এরা সকলেই মুসলমান, ইসলাম থেকে একটি চুল পরিমাণ দূরে সরে পড়াকে

তাঁরা আন্তরিকভাবে পসন্দ করেন না। কিন্তু কথা হলো যে, তারা নিজেরাই ইসলামের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ।

আমি 'উলামায়ে ইসলামের নিকট ও দরখস্তও পেশ করছি যে, নতুন কোন আইন যাতে করে ইসলামের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয় সে জন্য নতুন আইন-কানূনগুলো যেন তাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ব্যতীত প্রয়োগ হতে না পারে।

'উলামায়ে কিরাম স্মরণ রাখবেন যে, প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে বর্তমানে যে দর্বলতা ও একটি দোষ পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হচ্ছে ঐ সকল দেশের শাসকবর্গ ও উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকা। এমনিভাবে এসব দেশের অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ ব্যাপারে তারা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না। সুতরাং এহেন অবস্থার সংশোধন ও সংস্কারের একমাত্র পথ হলো তাদের ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আর তাদের প্রত্যেককে সেই পথে শিক্ষিত করে তোলা যেই পথে তারা অভ্যস্ত এবং যার সাথে তাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। দীনের ব্যাপারে নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে ইসলামের শিক্ষা দ্বারা বিদূরিত করতে মুসলমানরা কখনোই লজ্জাবোধ করে না।

পরিশেষে আমার নিবেদন হলো, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের প্রতি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার দোষ চাপিয়ে দেবার দ্বারা তাদের হীন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা আমি শুধু বাস্তব অবস্থাটিকেই পরিষ্কাররূপে আমার উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে নিচ্ছি। আমি নিজেই এ শ্রেণীর একজন লোক। শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করার পূর্বে আমি তাদের ন্যায়ই একজন গণ্ডমূর্খ ছিলাম এবং সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, জাহিলীপনা ও অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আমি অজ্ঞতার যে কুয়াশার মধ্যে নিপতিত ছিলাম, যার জন্য আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তার ভিতর আমার ভাই, বন্ধু ও মুসলিম জনসাধারণ নিপতিত থাকুক তা আদৌ আমি পসন্দ করি না।

আর আমি যে ‘উলামায়ে-কিরামের বিশেষ কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছি তার দ্বারা তাদের অলসতাকে তুলে ধরা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ হচ্ছে সেই বাস্তব অভিব্যক্তি, যার জন্য ইসলাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছে। কেননা আমার অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে মেলামেশা ও চলাফেরা আমার মধ্যে যেই বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি করেছে, তা হচ্ছে যে, ইসলামের জন্য সবচাইতে কল্যাণকর বিষয় হলো এসব সুধীমণ্ডলীর ইসলামকে সঠিকরূপে উপলব্ধি করা এবং সুস্পষ্ট পথে তা জ্ঞাত হওয়া। এখন ‘উলামায়ে-কিরামের কাজ হল, হয় আমার পরামর্শ ও অভিমতমাফিক তাদের কর্মসূচী গ্রহণ করে ময়দানে নেমে পড়ুন অথবা তা দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিন।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমি এ মুনাজাত করেই বিদায় নিচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে সেই কাজ করার তওফীক দান করেন, যার মধ্যে মুসলমান ও ইসলামের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমীন !

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমগ্র প্রশংসা সেই মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের তাঁর মনোনীত সরল-সহজ পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি যদি আমাদের তাঁর পথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমরা সরল-সঠিক পথ পেতাম না। আর আল্লাহ্র রসূল এবং আমাদের নেতা হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হাজারো দরূদ ও সালাম। হে মহামহীয়ান। আমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের ভুলক্রটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখুন। আমাদের পদযুগলকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমাদের আপনার মদদ দান করুন।

আধুনিক আইন সম্পর্কে দু'টি কথা

আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মিসরের রাষ্ট্রীয় আইন-কানূন সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা। একজন বিচারক হিসেবে এ আইনের সমালোচনা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। এ আইনগুলো যেভাবে রয়েছে, ঠিক সেভাবেই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব। এর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাব এবং একে হীনতার হাত থেকে রক্ষা করবো। কিন্তু আইনের খাতিরে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোবৃত্তির প্রেক্ষিতেই আমার ইচ্ছে হচ্ছে বর্তমান আইনের সমালোচনা করা। আমি আইনের বর্তমান রূপরেখা তুলে ধরবো বটে কিন্তু আইনের আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও মূলতত্ত্বের কোন বিরোধিতা করবো না। আমার এ আলোচনার দ্বারা যদি বর্তমান আইনের পবিত্রতা ও পূর্ণতার ধ্যান-ধারণা মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফল প্রকাশ পায় এবং এর সংশোধন ও পূর্ণতার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে, তবে এটা হবে মূল আইনেরই একটি খিদমত। আর এটাই এনে দেবে আমার সমালোচনার বৈধতার যৌক্তিকতা।

মতামত প্রকাশ আইনত নিষিদ্ধ

বর্তমান আইনের রাষ্ট্রে কর্মচারী বিশেষ করে বিচারালয়ের কর্মচারী- দের জন্য জনসাধারণের সমস্যার উপর মতামত প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একে

রাজনৈতিক তৎপরতার নামকরণ করে বেআইনী কাজ নিরূপণ করা হয়েছে। আইন প্রণেতাগণ এসব রাজনৈতিক বিষয়াবলীর সূচিপত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সবকিছু শামিল করে দিয়েছে। এমনকি যেসব বিষয় ব্যক্তি, সমষ্টি, জাতি ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় সম্মানের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা যেগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের সাথে বিজড়িত,সেগুলো আইনত একজন রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর জন্য মতামত প্রকাশের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে না। বর্তমান আইন প্রণেতাগণের ইচ্ছে হচ্ছে চেতনাসম্পন্ন জাগ্রত মানুষগুলোকে এমন একটি নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন মেশিনে পরিণত করে দেওয়া যেন তারা দর্শন ও শ্রবণ না করে অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে,অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে মূক করে দিয়ে সর্বোপরি তাদের নির্বাক করে দেয়।

এটা কি সম্ভব ?

অন্ধ,মূক,বধির চরিত্র গ্রহণ করে চলা কি যুক্তিসঙ্গত ? যেমন একজন বিচারকের পক্ষে কি কোন প্রকারে এটা সম্ভব হতে পারে যে, সে জ্ঞান-বুদ্ধির মাথা খেয়ে চেতনাশক্তিকে নষ্ট করবে অথচ সে দিন-রাত সামাজিক সমস্যার আবর্তে ঘূর্ণায়মান। সে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে এক বিরাট দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত দেখছে, সে বঞ্চিত শ্রেণীটিকে বহুবিধ বিপদের মধ্যে নিপতিত দেখছে, সে মজলুম জনতার আর্তনাদ ও মজদুরের ক্রন্দন বিলাপ শুনছে, সে সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, দৈন্য-দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক জুলুম-অত্যাচার, রাজনৈতিক বেঈমানী- বেইনসাফী এবং অবৈধ বল প্রয়োগের মর্মবিদারী দৃশ্যগুলো সকাল-সন্ধ্যা অবলোকন করে চলছে।

যে জাতির বুকের উপর বিদেশী শাসনের এমন জগদ্দল পাথর চেপে রয়েছে বা সমগ্র দেশকে গ্রাস করে নিয়েছে, খাদ্য ভাণ্ডারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, দেশের সমগ্র সম্পদকে দু'হাতে লুটছে, তাদের স্বাধীনতাকে পদদলিত করে চলছে, এর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতিকে নিজের তাবেদার বানিয়ে রাখতে চাচ্ছে, আর জাতির চরিত্রবান হিরোদের বিরুদ্ধে তাদের এমন ভাইদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছে যারা শয়তানের কাছে নিজেদের প্রাণ দীন-ধর্ম, নিজেদের দেশ ও স্বাধীনতাকে বিক্রয় করে ফেলেছে। যে জাতির আবাল-বৃদ্ধবনিতা এমনকি বৈদেশিক শাসনের মধ্যে চোখ খুলছে এবং বন্ধ করে চলছে,এমন জাতির বিচারকগণ কি শুধু নিছক

নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করতে পারে ? যে দেশের মান-সম্মানকে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে, যাদের স্বাধীনতাকে পদদলিত করে চলছে, জাগতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে দেশকে সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়ায় পরিণত করছে ; যার সর্বত্র বিবাদ সৃষ্টি করে রাখছে, যার অধিবাসীদের মধ্যে একের প্রতি অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রেখেছে, এদেরকে এমন কতকগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছে, যাদের তার নিজেদের অবস্থা নিয়েই দিন-রাত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, যার অধিবাসীদের বাহ্যিক রূপে ঐক্য ও সংহতির আবেষ্টনীর মধ্যে দেখা গেলেও তাদের পরস্পরের মন পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ, যে দেশের লোক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে খতম হয়ে যাচ্ছে, যে দেশের সামনে রয়েছে হয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অথবা লাঞ্ছিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার প্রশ্ন। অধিকন্তু যে দেশের নাগরিকদের অবস্থা হচ্ছে যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যদি তাদেরকে ক্ষমতার আসন ধার দেয়, তবে এসব নাগরিক সেই ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট হয়ে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া, একে অপরের গর্দান কর্তন করা, একে অপরের রক্ত বহিয়ে দেওয়া। সুতরাং দেশের বিচারালয়ের কোন বিচারক কি এহেন ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করে নীরব ভূমিকা পালন করতে পারেন ?

বে-আইনী সহ্য করা বিচারকের পক্ষে অসম্ভব

যে দেশে একজন সরকারী কর্মচারীর নিকট হতে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য অঙ্গুলির নখ উপরে ফেলা হয়, বেদম প্রহার করে অচেতন করে রাখা হয়, দেহে জ্বলন্ত লোহা দ্বারা দাগ কাটা হয়, দেহের চামড়া ছিলিয়ে ফেলা হয়, খাওয়া-দাওয়া ও ঔষধ-পত্র হতে বঞ্চিত রাখা হয়, উলঙ্গ করে লিঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়, দেহের গোপন স্থানে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাদের পিতামাতা ও ভাইবোনের প্রতি নির্মম অত্যাচার করার ভীতি প্রদর্শন করা হয়, এসব কর্মচারীর বাসায় পুরুষ না থাকাকালে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পুলিশ অবস্থান করতে থাকে, এমন দেশের একজন বিচারকের পক্ষে কি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা কোনক্রমেই সম্ভব ? আইন প্রয়োগকারীদের এসব অবস্থা অথবা এর চেয়ে মারাত্মক করুণ অবস্থাগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হবার

পর এ ব্যাপারে অতি নগণ্য কিছু ভূমিকা না নেওয়া কি বিচারকসুলভ কাজ হতে পারে ? এসব লজ্জাজনক অমানবিক জুলুম-অত্যাচারের কথা যখন নোটিশ দ্বারা আদালতে উত্থাপিত হবে এবং মজলুম ব্যক্তি আদালতে দণ্ডায়মান হয়ে তার প্রতি কৃত ঘটনাবলীর বিবরণ শোনাতে থাকবে, নিয়মতান্ত্রিকতা মাফিক দলীল-প্রমাণ ও ডাক্তারী সার্টিফিকেট পেশ করবে। কিন্তু রাষ্ট্র এসব ঘটনা তদন্তের নিষিদ্ধ এবং আইন ও আইনের রক্ষকদের সম্মান রক্ষার জন্য কোন ভূমিকাই গ্রহণ করবে না।

যে দেশে জনসাধারণ আইনের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা দেখায় না এবং যার মাথা তার লাঠি এ নীতি যেখানে কার্যকর রয়েছে, যেখানে আইন বেচারা লুটতরাজ ও জুলুম-অত্যাচারের বৈধতার হাতিয়ারে পরিণত হয়ে গিয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় পদ, ক্ষমতা এবং সর্বপ্রকার স্বার্থ দ্বারা ঐ লোকেরাই লাভবান হচ্ছে যারা শাসকদের কথায় বিনা-চিন্তায় সায় দিয়ে থাকে, যেখানে মুনাফিকীকেই সাফল্যের একমাত্র মাধ্যম ভাবা হয়, যেখানে দুশ্চরিত্রকেই সভ্যতা-ভদ্রতার প্রাথমিক শর্ত মনে করা হয় , এমন দেশ হতে সম্পর্কহীন হয়ে দূরে সরে থাকা কি কোন বিচারকের পক্ষে সম্ভব ? কোন বিচারক কি সন্তুষ্টচিত্তে এ কথা মেনে নিতে পারেন যে, তার দেশে সেই ঐতিহাসিক জাহিলিয়াতের পুনরাবৃত্তি ঘটুক, দুর্বলেরা দেহের রক্ত ঘর্ম ব্যয় করে উপার্জন করতে থাকুক এবং শক্তিধরেরা আরামে আরামে বসে মজা লুটতে থাকুক। দুর্বলেরা দেহ-আত্মার সম্পর্কটি ঠিক রাখার জন্য এক টুকরো শুকনো রুটি পাবে না, আর শক্তিমানেরা স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে পাশা খেলতে থাকবে। দুর্বলেরা অভিযোগ উত্থাপন করলে আইন এসে তাদের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করার মিথ্যা পাল্টা অভিযোগ করবে!

বিচারকগণ ধর্ম বিমুখতাকে নীরবে অবলোকন করতে পারেন না

কোন দেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় আইন ও ধর্মরূপে স্বীকার করে নেওয়া হলে তারপর যদি সে রাস্ট্র ও শাসকবর্গকে ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে দেখা যায় এবং তারা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণের রক্ত পিপাসু হয়, আল্লাহ্-ভীরুতা,নৈতিকতা ও সততার ধারক-বাহকদের প্রতি নির্মম অত্যাচার এবং অন্যায়, অসৎ ও অশ্লীলতার ধারক-বাহকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায়, তাহলে এহেন কার্যকলাপ একজন ন্যায় বিচারক কিরূপে নীরবে সহ্য করতে

পারেন ? এহেন অবস্থায় কি কোন বিচারক কোন একপক্ষ অবলম্বন না করে থাকতে পারেন,যখন সমগ্র দেশ নৈতিকতা শূন্য হয়ে অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ দুশ্চরিত্র নেতাদেরকে নিজেদের মডেল ও অনুসরণযোগ্য ভাবতে থাকে ?

বিচারকগণ কখনও নিরপেক্ষ থাকতে পারেন

যে জাতি কথায় ও কাজে আইনের প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করে, দুর্বল ও শক্তিশালী সমানভাবেই তার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে সমর্থন করে, কেবল এহেন ক্ষেত্রেই বিচারক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যে জাতি একটি ধর্ম গ্রহণ করে নিয়ে সে ধর্মকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে না, আইন প্রণয়ন করলে সে আইন প্রয়োগ করে না, ন্যায়, সুবিচার ও ইনসাফের দাবিতে সোচ্চার হলেও তা কার্যকর করে না, যে জাতি পারস্পরিক উপদেশ প্রদান, কল্যাণের পথে আহ্বান এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের বিরোধিতার দায়িত্ব পালন করে না, সে জাতির বিচারকগণ নিরপেক্ষ থাকার ইচ্ছে করলেও তা সম্ভব নয়।

আমার এ লেখা অধ্যয়ন করে বহু লোকের ললাটভূমিই ধূলিকণায় ভরপুর হয়ে উঠবে এবং আমার প্রতি ক্রোধে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তথাপি আমি এসব প্রতিমা পূজকদেরকে বলতে চাই যে,মানব রচিত এসব আইন-কানূন হচ্ছে বর্তমান যুগের লাত-মানাতরূপী প্রতিমা। এর আনুগত্য করে একজন মুসলিম তার আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে অসন্তুষ্ট করে এবং এর দ্বারা মুসলমানদের রাষ্ট্রগুলো আল্লাহ্ নির্ধারিত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানিয়ে থাকে।

এ প্রতিমা মন্দিরের একজন ব্রাহ্মণকে এসব প্রতিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দেখে এসব প্রতিমা পূজারীরা ক্রোধে জ্বলে উঠবে। আধুনিক আইনের সেবকদের মধ্যে একজন সেবক কিভাবে এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা ভেবেই তারা বিস্ময় বোধ করতে থাকবে। আমি আশা করি চতুর্দিক হতে আমার বিরুদ্ধে এ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে যে, হে লোকেরা! তোমাদের প্রতিমার সাহায্য-সহানুভূতি করার জন্য তোমরা দণ্ডায়মান হও। বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোল। তোমাদের প্রতিমা ধ্বংস করার পূর্বেই এ

লোকটিকে পাকড়াও করে ফেলো। কিন্তু তোমরা স্মরণ রেখো! এ বিদ্রোহকে তোমরা দমিয়ে রাখতে পারবে না। এ দাবি ও দর্শন এক ব্যক্তির নয়, এটি হচ্ছে একটি জাতিরই অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এ ডাক মানুষের ডাক নয় বরং এ ডাক হচ্ছে মানব অন্তরের মণিকোঠা হতে উত্থিত ঈমানের ডাক। এ বিদ্রোহ ইসলামের পথে এক মহা সংগ্রাম এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। এ পথেই আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে উপনীত হতে চাই।

আমি বিচারক হলেও মুসলমান

আমি একজন অমুসলিম বিচারক হলে বর্তমান যুগের আইনের প্রশংসায় ইউরোপীয়রা যেরূপ পঞ্চমুখ হয় আমিও তদ্রূপ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতাম। আমি অজ্ঞ জাহিল হলেও ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণ করে এ আইনগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম। কিন্তু আল্লাহর্ মেহেরবানীতে আমি এমন একজন মুসলিম বিচারক, অপরাপর মুসলিম বিচারকের তুলনায় ইসলাম সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখি। বর্তমান যুগের মানব রচিত আইন ও শরীয়তী আইনের পারস্পরিক মতদ্বৈততা সম্পর্কে যতদূর ওয়াকিবহাল রয়েছি, ততদূর ওয়াকিবহাল খুব স্বল্পসংখ্যক আইনবিদই রয়েছেন।

আমার নিরপেক্ষতা কুফরী

বর্তমান মানব রচিত আইনগুলো ব্যক্তিগত আচরণ, সামাজিক সমস্যা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন চরিত্রতত্ত্ব, সামাজিক সুবিচার দায়িত্ব-কর্তব্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সবগুলো ব্যাপারেই আলোচনা করে। এ সব ব্যাপারে একজন মুসলিম বিচারক অমনোযোগী ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন কেবল তখনই করতে পারে যখন সে ইসলাম পরিত্যাগ করে কুফরী গ্রহণ করে অথবা নির্বোধ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পাশবিক জীবন-যাপন করে। মুসলমানদের আসল শাসনতন্ত্র হচ্ছে ইসলামের শরীয়তী শাসনতন্ত্র। মানব রচিত আইনগুলোর মধ্যে যে আইনগুলো শরীয়তমাফিক হবে অথবা তার আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও তার মূলনীতি অনুযায়ী হবে, কেবল সেগুলোকেই একজন মুসলমান বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমমাফিক সেগুলোর আনুগত্য করতে পারে। আর যে আইন এর বিরোধী হবে, মুসলমানেরা সেগুলো পায়ে

মথিত করে চলবে। ইসলামের বিরোধিতা করে কোন বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে না। কোন সৃষ্টির এমন আনুগত্য করা যাবে না, যাতে করে আল্লাহ্‌র নাফরমানী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন মুসলমান হারামকে হারাম ভেবে করে ফেললে তাকে ফাসিক হতে হয়। আর হারামকে হালাল ও বৈধ ভেবে করলে পর তাকে কাফির ও মুরতাদ হতে হয়। একজন সাচ্চা মুসলমান আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে ফাসিক ও কাফিররূপে পেশ করাকে যে কোনক্রমেই পসন্দ করতে পারে না তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে আনুগত্য করতে নেই

ইসলাম মুসলমানদের উপর সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করাকে অপরিহার্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং পরে নির্ধারণ করে আমীরের বা নেতার হুকুমের আনুগত্য করার দায়িত্ব। ইসলাম মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র নাফরমানি করে গায়রুল্লাহ্‌র অর্থাৎ সৃষ্টির আনুগত্য না করাকেও অপরিহার্য দায়িত্ব ঘোষণা দিয়েছে। সুতরাং আমীর বা নেতার এমন কোন হুকুম ও আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বৈধ হবে না যা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সীমা হতে মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করে। কেননা কালামে পাকে সূরা নিসায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা,তাঁর রাসূল এবং আমীরের (নেতার) হুকুম মেনে চলো। কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ হলে সে ব্যাপারটি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কাছে সোপর্দ করো (অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে ফেলো), যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। এটাই হচ্ছে উত্তম এবং সুন্দরতম ব্যাখ্যা। —সূরা নিসা ঃ ৫৯

আল-কুরআনের এ আয়াতে একদিকে যেমন আমীর ও শাসকবর্গকে হুকুম করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে জনতা ও শাসিতদের প্রতিও তাদের হুকুম কার্যকর করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শাসকদের অধিকার এবং শাসিতদের দায়িত্বকে শর্তমুক্ত সীমাহীন করে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রের পক্ষে কোন কর্মচারীকে বা কর্মচারী নয় এমন লোককে ইসলামের বিরোধী হুকুম দেওয়ার বা আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া বৈধ নয়। এমনিভাবে শাসিতদের জন্যও শাসকদের হুকুম আদেশ ও আইন আল্লাহ্ ও রাসূলের তথা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে কার্যকর করা বৈধ হবে না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق –

অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

من امركم من الولاة فى غير طاعة الله فلا نطيعوه –

অর্থাৎ শাসকদের মধ্যে যারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য-বিরোধী হুকুম দেবে, সে হুকুম তোমরা মেনো না।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মুসলমানদের উপর ফরয

মানুষকে সৎ ও ন্যায় কাজের প্রতি অনুরক্ত ও উৎসাহিত করে তোলা এবং ক্ষেত্র বিশেষ হুকুম করা আর অসৎ, অন্যায় ও কুকাজ হতে মানুষকে বিরত থাকার নসিহত করা এবং প্রয়োজনবোধে বারণ করা মুসলমানদের অপরিহার্য দায়িত্ব। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ– وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ –

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত যাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা, সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং

অন্যায় ও কুকাজ হতে বিরত রাখা, (এ কাজ যারা করে) তারাই হচ্ছে সফলকাম জাতি। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৪

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমরা হচ্ছো সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় ও কুকাজ হতে বিরত রাখা।

—সূরা আল-ইমরান ঃ ১১০

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

মু’মিন নর-নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় ও কুকাজ হতে বিরত রাখে।

—সূরা তাওবা ঃ ৭১

الذين ان مكنا هم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر -

এরা এমন লোক যে, আমি এদেরকে এ জগতে শাসন ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং ন্যায়কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করবে । —সূরা হাজ্জ ঃ ৪১

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

এরা এমন লোক যে অন্যায় ও কুকাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে না বরং উহা করেই চলে, এদের কাজ অত্যন্ত খারাপ, অত্যন্ত ঘৃণিত।

—সূরা মায়িদা ঃ ৭৯

বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও এ দায়িত্বের অপরিহার্যতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া

যায়। হযরত আবূ বকর (রা) খুতবার মধ্যে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। পথভ্রষ্ট লোকেরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না যদি তোমরা হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। —সূরা মায়িদা ঃ ১০৫

তোমরা আল-কুরআনের এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলো যে, পরকালে নাজাতের জন্য সৎ কার্যাবলীই যথেষ্ট। সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের কোনই প্রয়োজন নেই। অথচ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে ইরশাদ করেছেন ঃ

"যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুকাজ হতে থাকে এবং সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ কুকাজ বন্ধ করার লোক বর্তমান থেকেও যদি তারা তা বন্ধ না করে বা করার চেষ্টা না করে, তবে অতিসত্বর আল্লাহ্ তা'আলা এদের সকলকেই এক সাধারণ আযাবে নিপতিত করবেন।"

এ ব্যাপারে আমি আরো কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমরা অবশ্যই ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও কুকাজ থেকে মানুষকে বারণ রাখার চেষ্টা করে যাবে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দুষ্ট-দুরাচার লোকদেরকে শাসন বা প্রভাবশালী করে দেবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে প্রার্থনা করলেও তা কবূল হবে না।"

তিনি (স) আর এক হাদীসে বলেছেন ঃ

"জিহাদের তুলনায় অন্যান্য নেক কাজ হচ্ছে সাগরের একটু পানির ছিঁটা। আর সমুদয় নেক কাজ ও জিহাদ হচ্ছে ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও কুকাজ থেকে বারণ রাখার তুলনায় সমুদ্রে নাড়া দেওয়ার পর বিচ্ছুরিত পানির ন্যায়।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ "যারা জালিম ও অত্যাচারী শাসকদের সামনে দন্ডায়মান হয়ে 'আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' করে অর্থাৎ ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও কুকাজ থেকে বারণ করার চেষ্টা করে, অতঃপর সেই জালিম শাসকদের দ্বারা নিহত হয়, তারাই হচ্ছে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম শহীদ। পরকালে জান্নাতে হযরত হামযা ও জাফর (রা)-এর ন্যায় এদের মর্যাদা হবে এবং তাদের সাথেই বসবাস করবে। যে জাতি আদল ইনসাফের হুকুম করে না এবং আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করে না, তারা অত্যন্ত দুষ্ট-দুরাচারী জাতি।"

তিনি (স) অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে কোন এক লোক অন্যায় ও কুকাজ হতে দেখলে হস্ত দ্বারা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। এটা সম্ভব না হলে মুখের দ্বারা বন্ধ করার চেষ্টা করবে, এটাও সম্ভব না হলে সে কাজের প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করতে থাকবে, এটাই ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"

আমরু বিল মা'রুফের অর্থ হচ্ছে মানুষ যাতে করে কথায় ও কাজে শরীয়তের পাবন্দ হয়ে ইসলামের বিধান অনুসরণ করে চলে, সেজন্য বিভিন্ন উপায়ে তাদের মধ্যে তার শিক্ষা, তালীম-তরবীয়ত প্রচার করে যাওয়া। আর নাহি আনিল মুনকারের অর্থ হচ্ছে শরীয়ত যে সব কাজ পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম দিয়েছে সে সব কাজ যাতে করে মানুষ পরিত্যাগ করে চলে সেজন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা। ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় ও কুকাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্বটি মুসলমানদের ইচ্ছা ও মর্যির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি যে, ইচ্ছা হলে তারা করবে, না হলে না করবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এ কাজটি একটি সুন্দর ও পসন্দনীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, যদি করা হয় তো খুব উত্তম, না করা হলে কোন দোষ নেই। এ কাজটি নিঃসন্দেহে মুসলমানের উপর ফরয কাজ। এটি সম্পাদন না করে কোন উপায় নেই।

এ দায়িত্বকে এড়িয়ে চলা এবং এ সম্পর্কে অমনোযোগী হওয়া কোনক্রমেই বৈধ নয়। সমগ্র জাতির উপর সামগ্রিকভাবে একটি দায়িত্ব। দুনিয়া হতে অন্যায়-অবিচার ও কুকাজকে মিটিয়ে ফেলা এবং সুকাজের প্রচলনের জন্য এ

দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত আবশ্যক। এ দায়িত্ব যেমন সাধারণ মানুষের তেমনি এ দায়িত্ব হয়েছে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও শাসকদের। রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়গুলোর উপরও এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। কেবল এ দয়িত্ব সম্পাদনের দ্বারাই সমাজ-জীবন হতে দুর্নীতি- দুষ্কৃতি ও অন্যায়-অবিচার বিদূরিত হয়ে সুনীতি-সুকৃতি, ন্যায় ও সুবিচারের পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

বর্তমান যুগটির অবস্থা হচ্ছে যে,অন্যায় ও দুর্নীতিতে সমগ্র দুনিয়া ছেয়ে গেছে। মানুষ নির্বিবাদে অবাধ স্বাধীনতায় বুক ফুলিয়ে দুষ্কৃতি চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেরা যেমন তা থেকে বিরত থাকে না তেমনি অন্য কোন লোককেও বিরত রাখার চেষ্টা করে না। শাসক ও শাসিত উভয়ে মিলেই এ অন্যায় ও দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, তাঁর নির্ধারিত হারামকে হালাল ভাবছে। রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের জন্য এমন সব আইন-কানূন রচনা করে দিচ্ছে যার দ্বারা মুসলমান কুফরী-শিরকীর পানে ধাবিত হচ্ছে। এহেন দুঃখজনক অবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে 'আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের 'দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। একজন মুসলিম সে সরকারী কর্মচারী হোক বা না হোক, চাকরিজীবী হোক বা না হোক, আদালতের বিচারক হোক বা না হোক— তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে অনৈসলামিক আইনগুলোকে ইসলামী আইনে রূপান্তরিত করা। সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানের পক্ষে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একে অপরের সাহায্য-সহানুভূতি করে যাওয়া একান্ত জরুরী। এ কাজে নিজের হাত, শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা সাহায্য করা সম্ভব না হলেও মুখের দ্বারা এবং লেখনী দ্বারা সহায়তা করা উচিত।

এমনিভাবে যেমন কল্যাণ ,ন্যায়, সুবিচার ও সুকৃতির বেলায় একে অপরের সাহায্য-সহানুভূতি করা মুসলমানের উপর ফরয, তেমনি অন্যায়, ও দুষ্কৃতিমূলক কাজে সহায়তা না করাও ফরয। মুসলমানরা এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর খাস রহমত দ্বারা সাহায্য করবেন এবং বাতিল শাসন-ক্ষমতাকে খতম করে দেবেন। ইসলামী জামা'আত তথা মুসলিম দলগুলোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের হাত রয়েছে। বান্দা আল্লাহ্র কাজে যখন নিজের ভাইয়ের প্রতি সাহায্য- সহানুভূতির হস্ত সম্প্রসারিত করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। সুতরাং প্রত্যেক

মুসলমানের উচিত অনৈসলামী আইনের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করে যাওয়া। এ দায়িত্ব পালনের বিরুদ্ধে জাহিল লোকেরা যত কিছু বলুক,যত কিছু করুক না কেন, তারা মুসলমানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, মুসলমানদের কাছে নিজেদের কার্যের অনুকূলে ধর্মীয় দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি থাকতে হবে এবং তার প্রতি অটল,অনড়,পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এ মূলতত্ত্বের কথাই আল-কুরআনে এমনিভাবে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ –

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদের চিন্তা-ভাবনা করো। পথভ্রষ্ট লোকেরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সত্য ও হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার। —সূরা মায়িদা ঃ ১০৫

আইনের অবদান

আইনের উদ্দেশ্য

মূলত আইন এমন একটি অপরিহার্য বিষয়, যার দ্বারা মানব সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমেই সমাজের ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং জুলুম-অত্যাচারের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয় ও সবার অধিকার সংরক্ষিত হয়। আর সামাজিক জীবনে সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের প্রয়োজনই আইন সংস্থার জন্ম দিয়েছে এবং এর প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশকে সম্ভাবনাময় করে তুলছে । এর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনই এর ধর্ম। মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দে রাখাই হচ্ছে আইনের মূল উদ্দেশ্য। আইনের প্রয়োজন এ কারণেও দেখা দেয় যে, এমন লোক আছে তাদের বিরুদ্ধে যদি শক্তি ব্যবহার করা না হয় তবে তারা এমন সব কাজ করে বসবে, যা সামগ্রিক দিক দিয়ে সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক জীবনকে একটি আইনগত ব্যবস্থাপনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বস্তুত আমাদের এ আলোচনা দ্বারা এ কথাই প্রকাশ পায় যে,আইন মানব সমাজ বহির্ভূত এমন কোন বস্তু নয়, যাকে ব্যক্তিগত সামাজিক স্বার্থকে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে ব্যক্তি অথবা সমাজের জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ লাভ এবং ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

আইনের যে রূপরেখাই হোক না কেন, তা সমাজের মুক্তি, সাফল্য ও কল্যাণের হাতিয়ার বিশেষ। আইনের দ্বারা যদি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়, তবে তা শুধু অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাকে দূর করার জন্যেই করা হয়। আইন যদি অপরাধীর জন্য শাস্তি ঘোষণা করে, তবে তা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অপরাধ-প্রবণতা দূরীভূত করার জন্যেই করে থাকে। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে পারে এবং কারো অধিকার হরণ করা না হয় সেজন্যই আইন জুলুম-অত্যাচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আইনের প্রভাব-প্রতিপত্তি

ও তার উপস্থিত বৈধতার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সমাজের সেবা ও সৌভাগ্যের উপকরণ সংরক্ষণ করা। যে আইন তার আসল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তা সম্পূর্ণ বিবর্জিত। কোনরূপ শ্রদ্ধা,সম্মান ও আনুগত্য লাভ করার অধিকার সে আইনের নেই। বরং এহেন আইনের মূলোৎপাটন করাই কর্তব্য। এমন আইনের সম্মুখে যদি আমরা শ্রদ্ধাবনত হই ও মনে-প্রাণে তাকে সমর্থন করি, তবে তার অর্থ হচ্ছে আমরা সমগ্র সমাজের উপর জুলুম-অত্যাচার করে চলছি এবং সামাজিক অধিকার পদদলিত করে যাচ্ছি।

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আইন রয়েছে

বিভিন্ন দর্শন,ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের অধিকারী জাতিগুলোর আইন- ব্যবস্থা অন্যান্য জাতির আইন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রত্যেক জাতির আইন তাদের চিন্তাধারা ও অনুভূতির দর্পণ বিশেষ। জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে আইনের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক আইনের মধ্যেই জাতির নৈতিক, মানসিক সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার একটি প্রতিবিম্ব বর্তমান থাকে। জাতীয় মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা আইনের বিভিন্নতার রূপরেখায় অনিবার্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে। জাপানের আইন-কানূনগুলো ও ভারতীয় আইন কানূনগুলোর মধ্যে ততোখানিই বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে, যতখানি বিভিন্নতা ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে জাপানী ও ভারতীয় জাতিগুলোর নিজস্ব ধর্ম, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে। রাশিয়ান আইন ও বিলেতী আইনের ততোখানিই বৈসাদৃশ্য বর্তমান যতখানি এ দু'টি জাতির দর্শন ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিরাজমান। এ দিক দিয়ে আমরা যখন সাধারণ কথায় কোন বিশেষ আইনের সংকলনকে কোন একটি বিশেষ জাতির দিকে সংযোজিত করি; তখন এ সংযোজন শুধু বাহ্যিক নামের সীমারেখাটিই নয় বরং একটি তত্ত্বগত যোগসূত্র এবং সম্পর্কের কথাও প্রকাশ করে দেয়। এ কারণেই প্রত্যেকটি জাতি তাদের নিজস্ব আইন সংরক্ষণের জন্য সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় প্রস্তুত থাকে এবং তার অবমাননা নিজেদের অপমান ও অবমাননা মনে করে। ফলে এক জাতির আইন প্রণয়নকারিগণ যদি অপর কোন জাতির আইন ধার নেয় তবে তাকে যেমন তেমনরূপেই নিজেদের আইনের মধ্যে শামিল করে নিতে পারে না; বরং তার

মধ্যে সংশোধন ও সংস্কার করে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করে নেয় যেন নিজেদের আইনের ছাঁচে তাকে বেমানান ও সামঞ্জস্যহীন বলে মনে না হয়। প্রত্যেকটি জাতিই এ কথা সম্যক অবহিত রয়েছে যে, বিজাতীয় দাসত্ব ও চাকরি গ্রহণের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে তাদের আইনকে যৎকিঞ্চিত পরিবর্তন করে নিজেদের সমাজে প্রচলিত করে দেওয়া। আর এ কাজের অর্থ হচ্ছে একটি জাতি তার নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বিজাতীয় আনুগত্যের মালা গলায় ধারণ করে নেওয়া।

ইসলামী জাহানে বৈদেশিক আইন

খুবই দুঃখের বিষয় যে, উপরোল্লিখিত আইনের নীতিমালাগুলোকে মিসরসহ অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোতে চরমভাবে পদদলিত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর আইন-কানূনের বিরাট এক অংশকে হুবহু আমদানী করে এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ ইসলামী দেশগুলোতে তেরশত বছর যাবত কম-বেশি ইসলামী আইনের শাসন ও প্রভাব- প্রতিপত্তি বিরাজ করছিল। এসব দেশের অধিকাংশই ইসলামী জীবন দর্শনের উপর ঈমান রেখে থাকে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার আদেশ- নিষেধ ও বিধি-বিধান কার্যকর করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন। যারা পাশ্চাত্যের আইন গ্রহণ করেছিল তাদের মুসলমানদের বর্তমান ও অতীত দিনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এসব অন্ধ অনুসারীদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা খুব অল্পই ছিল বলে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ফলে মুসলিম দেশসমূহে এ বৈদেশিক অপরিচিত আইন-কানূনগুলো সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেছিল—যার মধ্যে মুসলমানদের অতীতের কোন আলোর ঝলক ছিল না। আর এর মধ্যে যেমন মুসলমানদের বর্তমান সমস্যার কোন সমাধান ছিল না, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য এর ভিতর পথ প্রদর্শনের কোন আলোকবর্তিকা ছিল না; বরং এসব আইন-কানূন ছিল মুসলমানদের আকীদা, দর্শন ও ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এসব আইনের বীজ অপরিচিত মাটিতে বুনেছিল এবং অপরিচিত পরিবেশেই এর ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। ঘটনাচক্রে এ পাপপ্রবণ দুষ্ট আইনের চারাগুলোকে এনে এমন স্থানে রোপণ করা হলো যেখানের অধিবাসীরা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে এবং একে সমূলে উৎপাটিত করার সংগ্রাম করতে বাধ্য। এ আইনগুলো আমাদেরকে কুফরী

ও নাস্তিকতার পানে গলাধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলছে। আমাদেরকে চরম উদারবাদী ও মতিছিন্ন স্বাধীনতার শিক্ষা দিচ্ছে। এর নীতি আদর্শের সাথে আমাদের অবস্থা ও পরিবেশের সামান্যতম সম্পর্কও বর্তমান নেই।

আইন আকীদা-বিশ্বাসের নিরাপত্তা বিধানকারী

ব্যক্তি ও সমষ্টির জাগতিক প্রয়োজন ব্যতীত তাদের দর্শন ও চিন্তাধারার নিরাপত্তা বিধান করাও আইনের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের দর্শন ও চিন্তাধারার মূল প্রস্রবণটি হচ্ছে আল ইসলাম। আমাদের আইন প্রণেতাগণকে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কিছুমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি দিতেন, তবে প্রত্যেকটি আইনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম তাদের লক্ষণীয় বিষয় ছিল, সেগুলো ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রাখে কি না, সেগুলো কি দীনী রীতিনীতির অনুগামী না বিপরীত। ফলে বর্তমানে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে যে, এ আইনগুলো প্রকাশ্যেই ইসলামী আইনকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ইসলামী নীতিমালাগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে, ইসলামের অধিকার ও দায়িত্বাবলীর পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে আমাদের বর্তমান আইনগুলোও আইনের মূল প্রাণসত্তা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকেও পদদলিত করে চলছে। যে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আইন রচনা করা হয় সে ব্যাপারে তা বিরাট ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। স্বীয় অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মধ্যে ক্ষুদ্রতম কারণও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যাপারে আইনের কোনই অপরাধ নয়। বরং সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী হচ্ছে সেই পণ্ডিতেরা, যারা আইন সংকলন করেছে। ফলে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং আমাদের আশেপাশে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার ভাব বিরাজ করছে। আর ইসলামী জাহানের উপর পুরাদমে চলছে পাপ ও পঙ্কিলতার দৌরাত্ম্য।

কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য

আমাদের কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইউরোপীয় আইনগুলো অকল্যাণ খারাপ ও পাপের পথেই আমাদের পথ প্রদর্শন করছে। সে আমাদের ধ্বংস ও অবনতির গভীর খাদে নিক্ষেপ করার প্রয়াস

পাচ্ছে। মুসলিম জাতি জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় যে সর্বাধিক কল্যাণকামী ও পুণ্যের সর্বাধিক কাছাকাছি থাকতো এবং সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি নীতির প্রতি বাস্তবরূপে অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল ছিল,ইতিহাসই তার জ্বলন্ত সাক্ষী। কিন্তু যেদিন হতে মুসলিম দেশগুলোতে এ অপরিচিত আইনের প্রচলন শুরু হলো সেদিন থেকেই আমরা সম্মান ও মর্যাদার আসনটি হারাতে বসেছি। আমরা নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে পড়েছি। আমাদের মধ্যে আত্মপূজা স্বার্থপরতা জড়বাদিতা ও সুযোগ সন্ধানীর মত হীন চরিত্রের সাধারণ প্রচলন হয়ে গিয়েছে। জায়েয-নাজায়েয বৈধ-অবৈধ ও হালাল-হারামের বিবেচনা আমাদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ ওঠে গিয়েছে। এমন একটি সময় ছিল যে, আমাদের নৈতিকতার উদাহরণ দেওয়া হতো। আর আমরা বর্তমানে এমন একটি সময় অতিবাহিত করে চলছি যে, আমরা পশুর ন্যায় নিজেদের পাশবিক চাহিদার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে চলছি। শুধু এতটুকু করে আমরা ক্ষান্ত হইনি বরং বন্য পশুর ন্যায় শিকারের অনুসন্ধানে সময় অপচয় করছি।

আইন অবৈধ সুবিধালাভ থেকে বিরত রাখে

আইনের আর এক উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তা অবৈধ উপায়ে লাভবান হওয়া ও জোর-জবরদস্তি হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাহানের আইনগুলোর অবস্থা হচ্ছে, সেগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থের সংরক্ষণ, তাদের অন্যায়-অবিচার ও লুটতরাজকে আইনের রূপদান, মুসলমানদের চিরজীবন অর্থনৈতিক গোলামীতে আবদ্ধকরণ এবং তারা যেন কখনো দারিদ্র্যের অভিশাপ ও নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করতে না পারে সে জন্যই রচনা করা হয়েছে। সমগ্র মুসলিম জাহানে আজ এই একই অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে মিসরীয় আইনকে উদাহরণসরূপ পেশ করছি।

১৯৪৫ সনে বৃটিশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হতে যখন অবসর নিল তখন তার ঘাড়ে ছিল পঞ্চাশ কোটি মিসরীয় ঋণের বোঝা। আমাদের দেশ কি এত বড় বিরাট ধনী ছিল যে, সে এত বিপুল পরিমাণে ঋণ বৃটিশকে দিতে পারে? স্পেন যে মিসরের কাছে ঋণ চেয়েছিল সে ঋণ কি মিসর দিয়েছিল, কখনোই নয়। এটা ছিল বিরাট এক লুটতরাজ ও ডাকাতি, যাকে আইনের জুলুম-অত্যাচার ঋণের

নাম দিয়েছিল। এমনিভাবে মিসরীয় আইন ইংরেজদের জন্য জবরদস্তিমূলক লাভবান হবার বহু অবৈধ পথ বৈধ করে দিয়েছিল। এ আইন মিসরের দরিদ্র জনতার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বৃটিশ জাতির উদরপূর্তি করতো। মিসরীয় আইনানুসারে ইংরেজদের জন্য আমাদের স্টার্লিং রিজার্ভের ভাণ্ডারটি থেকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করার অধিকার রক্ষিত ছিল। ইংরেজদের একটি 'পারিবারিক ব্যাংকের ন্যায়' একটি ইংরেজ সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। স্পেনীয় ট্রেজারীর অর্জিত সম্পদের মুকাবিলায় এ ব্যাংক হতে মিসরীয় কারেন্সী গ্রহণ করা আইনত বৈধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে বহুতর পথে মিসরীয় পুঁজির উপর জবরদস্তিমূলক হস্তক্ষেপ করার একটি আইনগত রূপরেখা রচনা করা হয়েছিল। বৃটিশ হুণ্ডির বিনিময়ে ইংরেজরা আমাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামত লুট করে নিয়ে যেতো। এ ধরনের আইনকে কি কখনো সুবিচারী ও ন্যায়ের প্রতীকরূপে অভিহিত করা যেতে পারে, যে আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি জাতি তাদের পেট ফেঁড়ে অপর জাতির পেটের উনুনের জন্য ইন্ধনের যোগানদারী করবে? একটি জাতি জীবনে বেঁচে থাকার লড়াই করছে, আর তাদের কাঁধের উপর দণ্ডায়মান হয়ে অপর জাতি আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করছে, এটা কোন্ সুবিচারী আইন?

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই আমরা এই বিরাট আকারের ঋণ পরিশোধ করার দাবি করে আসছিলাম। আমরা এ পর্যন্ত ঋণের সম্পদ ফেরত পেলে জাতীয় জীবনের উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করে সাফল্যের বহু সোপান অতিক্রম করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু আমাদের দাবির জবাবে ইংরেজরা টালবাহানা শুরু করছিল। তারা আমাদের নেতৃবৃন্দের কাছে বলতে লাগলো যে, আমরা বিগত মহাযুদ্ধে মিসরকে সাহায্য করেছি এবং মিসরের সর্ববিধ নিরাপত্তাবিধান করেছি। সুতরাং এ জন্য আমরা এ ঋণের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা চাই। আমরা কি ইংরেজদের কাছে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম? কিছু সময়ের জন্য তাদের সেনাবাহিনী আমাদের দেশে অবস্থান করুক এমন আশা কি আমরা প্রকাশ করেছিলাম? আমরা কি কারোর বিরুদ্ধে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে কি কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল? দুঃখের বিষয় এখনো আমাদের চক্ষু খোলেনি। আমরা ইংরেজদের আইন পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি

না। আমাদের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ইংরেজরা দু' হাতে লুটে নিচ্ছে। এমন কি বাজারের তরি-তরকারী- ফলমূলও আমরা তাদের কাছে হাযির করে থাকি। তাদের নেওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা অত্যধিক চড়া মূল্যে ধনীরা ক্রয় করে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে গরীবের দল অনুশোচনার দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এমনিভাবে লোহা-লক্কড়, কাঠ সিমেন্ট সাজ-সরঞ্জাম ইংরেজ সেনাবাহিনীর শিবিরে এবং তাদের অফিসারদের বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এ সব জিনিসের মূল্য দেওয়া হয় না। বরং বৃটিশের ট্রেজারীতে আমাদেরকে পরিশোধযোগ্য ঋণের আকারে জমা হতে থাকে। এগুলো পরিশোধ যে কখন করা হবে তা আল্লাহ্ই মালুম। অথচ এগুলো পরিশোধ করার অঙ্গীকার করা হলেও আমরা তা বিরাট উপকার মনে করতাম এবং এর বিনিময়ে আমাদের মস্তক অবনত হয়ে যেত। এতকিছু করা হচ্ছে এর অর্থ কি এ নয় যে, আমাদের আইন হচ্ছে আমাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করার দুর্বিনীত হাতিয়ার ? আর তা আমাদের প্রাণের শক্ররা আমাদের রাষ্ট্র ও আইনের নিরাত্তার জন্য এ সব কিছু নির্বিবাদে ব্যবহার করে যাচ্ছে ?

মিসরীয় আইন সাম্রাজ্যবাদীদের সেবক

মিসরীয় আইনগুলো বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং বৈদেশিক স্বার্থের সংরক্ষণ ও সেবা করে চলছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সেবা করার নিমিত্ত এবং মিসরীয় জনতার রক্ত শোষণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এ আইনগুলোর প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ আইনগুলোর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসরীয় জনতাকে হিদায়ত ও কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে অকল্যাণ ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা। আর তাদেরকে দুর্বলতা ও অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জিত রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত করা। আমাদের দেশে রেভিনিউ, ট্যাক্স ও কাস্টম ডিউটি সম্পর্কীয় যতগুলো অর্থনেতিক আইন প্রচলিত রয়েছে, তার দ্বারা মিসরীয় গরীব কিষাণ-মজুরদের পকেট শূন্য করে ইংরেজ পুঁজিপতিদের ঝোলা ভরা হচ্ছে। এ আইনগুলোর একমাত্র লক্ষ্য যে বৃটিশ বাণিজ্যকে উজ্জ্বল করে তোলা এবং মিসরকে বৃটিশ পণ্যের বাজারে পরিণত করা তাতে কোনই সন্দেহ নেই।এখানে আমদানী সংক্রান্ত এমন আইন চালু রয়েছে যার উপর নির্ভর করে স্পেন ব্যতীত অন্যান্য দেশে সেইসব পণ্যসম্ভার ও শিল্প

দ্রব্যের আমদানী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, যার সাথে দর কষাকষির দিক দিয়ে স্পেন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ লোকেরই একথা জানা আছে যে, জাপানী পণ্যদ্রব্য শুধু সীমাতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধার্যের কারণেই মিসরে আমদানী হচ্ছে না। অন্যথায় জাপানী মোটর গাড়ী, রেডিও ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য স্পেনের তুলনায় পাঁচগুণ সস্তা দামে পাওয়া যায়। মিসরের অগণিত উপায়-উপকরণ সাম্রাজ্যবাদীদের স্থিতিশীলতার জন্য ব্যয় হচ্ছে। আমরা যে রাস্তা নির্মাণ করছি এবং রেল লাইন তৈরি করছি ইংরেজরা সেগুলো তাদের সেনাবাহিনী ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছে। আমরা যে সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ করছি সেখানে ইংরেজদের জাহাজগুলিই নোঙ্গর করা হচ্ছে। আমরা তার ও টেলিফোন লাইন বিস্তার করে চলছি কিন্তু ইংরেজরা তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। ইংরেজ এবং তার সহযোগীদের জন্য পানাহারসহ অন্যান্য যেসব সামগ্রীর যোগান দেওয়া হচ্ছে মিসরই হচ্ছে তার সর্বসেরা যোগানদার। কিন্তু এ যোগানদারী থেকে একটি পয়সাও আমদানী হচ্ছে না। কেননা তারা সর্বপ্রকার ট্যাক্স ও কাস্টম ডিউটির উর্ধ্বে। আমাদের গাড়ি-ঘোড়া এবং সরবরাহের বাহনগুলোর জন্য অতিশয় নগণ্য পরিমাণের মাশুলও বৈদেশিক হিসাবে ধার্য করা হলে অপারগতা ও অন্যমনস্কতা প্রদর্শন করা হয়। খোঁড়া অজুহাতের দোহাই দিয়ে মাশুলের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়।এ সব কিছুই আইনের নাকের ডগার উপর করা হচ্ছে অথচ আইন বেচারা নীরব ভূমিকা প্রদর্শন করে যাচ্ছে। বৈদেশিক সুদখোরদেরকে আইনের পক্ষ হতে মিসরের গরীব জনতার রক্ত চুষে চুষে পান করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে মিসরীয়রা দিন দিন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে রসাতলে যাচ্ছে এবং বৈদেশিক মহাজনরা হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি বিরাট পুঁজিপতি। আজ মিসর দেশটি এসব হারামখোর জুয়াড়ীদের চারণভূমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তারা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করছে। আমাদের দেশের বড় বড় ব্যাংক ও কোম্পানী-গুলোর মালিক হচ্ছে বিদেশীরা। ব্যবসা-বাণিজ্য,কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের অধিকাংশ পুঁজির মালিক হচ্ছে বিদেশীরা। আমদানী-রফতানী বিদেশীদের মাধ্যমেই হচ্ছে। যেদিন আমাদের দেশে সুদী কারবার ও লেনদেনকে আইনগতরূপে বৈধ করা হয়েছে সেদিনটি ছিল আমাদের জন্য খুবই অভিশপ্ত ও অকল্যাণময়ী দিন।

মুসলমানদের ধর্মে সুদী কাজ-কারবার সম্পূর্ণ হারাম। মুসলমানরা অত্যন্ত নাযুক ও কঠিন অবস্থায় সুদী ঋণ গ্রহণে গুনাহগার হয় বটে কিন্তু তারা ধর্মের প্রতি কিছুমাত্রও শ্রদ্ধাশীল থাকলে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া এবং সে জন্য সুদ নেওয়ার আগ্রহী কখনোই হতো না। যার ফলে সুদদাতা হয়ে পড়েছে অধিকাংশ মিসরীয় মুসলিম জনতা এবং সুদ গ্রহীতা হচ্ছে বিদেশী লোকেরা। এমনিভাবে সম্পদের এক তরফা বিবর্তনের দরুন সমগ্র মিসরীয় পুঁজি বিদেশীদের হাতে গিয়ে পুঞ্জিভূত হচ্ছে। ফলে দিন দিন নিঃশেষ হয়ে পড়ছে মিসরীয় জনগণ।

এমন কি মিসরে বিদেশী আইনের ফলে মদ্যপান ও ব্যভিচারীও সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়ে চলছে।

নাগরিক অধিকার হরণ

এমনিভাবে আমাদের রাস্ট্র সাম্রাজ্যবাদীদের আঙ্গুলের ইশারায় মিসরীয় জনতাকে নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করছে। তারা আমাদের চলাফেরা, সভা-সমিতি, লেখা ও বক্তৃতা-বিবৃতির উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করছে। একটি ইসলামী দেশ হতে অপর একটি ইসলামী দেশে যেতে হলে বহু শর্ত পূরণ করার পরই সে দেশে যাওয়া যায়। এমনকি একই দেশে এক স্থান হতে অন্যস্থানে যাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই মুশকিল। যেমন মিসর হতে সুদানে যাওয়া, উত্তর সুদান হতে দক্ষিণ সুদানে যাতায়াত করা খুব সহজ নয়। সভা-সমিতি, মিছিল-শ্লোগান, প্রকাশনা দল ও সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে এখনো আমাদের দেশে সেই আইনই চালু রয়েছে যা বহুদিন পূর্বে বিদেশী শাসকদের স্বার্থের অনুকূলে রচনা করা হয়েছিল এবং যার দ্বারা জাতিকে স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার হতে বঞ্চিত করে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। হাতিয়ার ও অস্ত্রের ব্যাপারে এখানে এমন আইন চালু করে দেওয়া হয়েছে যার কারণে অস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় এবং রাখা ও ব্যবহারের উপর নানারূপ বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা যাতে করে সর্বদা দুর্বল হয়েই থাকি এবং অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কোন জ্ঞানের অধিকারী না হই তা-ই হচ্ছে এ আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং পরিণতি যা হবার তা-ই হচ্ছে। অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং আমাদের দেশের উপর তাদের অবৈধ দখল হতে উৎখাত করা আমাদের উপর ফরয।

এই হচ্ছে সেই দুষ্ট নীতিমালার বিবরণ, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের আইনের কাঠামোটি দাঁড় করানো হয়েছে এবং যার মধ্যভূমিতে সুনীতি- গুলিকে কুরবানী দেওয়া হচ্ছে। ফলে এর দ্বারা এক দিকে যেমন আমাদের জাগতিক স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে, অপরদিকে আমাদের পরকালীন স্বার্থেরও ব্যাঘাত ঘটছে। এর দরুন অন্যায়-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি প্রসার লাভ করছে এবং দরিদ্র, বুভুক্ষ, গোলামী ও অবমাননা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো আমাদের আইন নয় বরং এগুলো হচ্ছে আমাদের শত্রুদের আইন। আইনের এহেন শিকল দ্বারা বেঁধেই বিদেশীরা আমাদেরকে গোলামীর বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখছে। এ আইনগুলোর সাথে আমাদের কোনরূপ বৈধ ও সঠিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে আমাদের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চিন্তা করুন, আমরা কত বড় ভাগ্য বিড়ম্বনার মধ্যে নিপতিত ! অথচ এ আইনগুলোই কুফরী ও দারিদ্রের পানে গলায় রশি লাগিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ইহাই আমাদের জাতীয় অধঃপতন ও অনৈক্যের কারণে পরিণত হয়েছে।

আইনের শাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আইনকে সমাজ কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না এবং এর কার্যকারিতা হতে দূরে সরেও থাকতে পারে না। আইনের উপর নির্ভর করেই সমাজের সংগঠন, জুলুম-অত্যাচার ও শোষণ-পেষণের অপনোদন এবং অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। আর আইনের মাধ্যমেই সামাজিক জীবনে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠে,বিশ্বের সকল জাতি কল্যাণ ও পূর্ণতার সোপানে পারে আরোহণ করতে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের খাতিরেই আইনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করা অপরিহার্য। আর এটা করা হলেই আইনের মূল প্রাণকে বিবর্তন ও বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। মোটকথা, আইনের ব্যবস্থাপনাটির দৈহিক ব্যবস্থাপনার ন্যায় দু'টি দিক রয়েছে। মানব যেমন দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত তেমনি আইনেরও একটি আত্মা ও একটি দেহ রয়েছে। আইনের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা কার্যকর থাকে এবং জাতির লোকদের থেকে সে যে তার সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার স্বীকৃতি নিয়ে নেয় সেটিকেই আইনের প্রাণ নাম দেওয়া হয়। আর আইনকে যে ভাষার অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়, সেটাকে বলা হয় আইনের

দেহ। যে আইন কাঠামোটি মানষের মন-মগজ ও অন্তর-আত্মার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম না হয় সে আইন অন্তঃসারশূন্য,দেহ ও প্রাণহীন মৃতদেহের ন্যায় কাগজের পৃষ্ঠায় ভাষার রূপ দেওয়া সত্ত্বেও এ আইনের মূল্য ততটুকু নেই যতটুকু মূল্য রয়েছে তার কাগজের টুকরোগুলোর। আইনের যোগ্যতা ক্ষমতা এহেন প্রভুত্ব ও শাসনের উপরই নির্ভরশীল। এ প্রভুত্ব ও শাসন যত যোরদার হবে,আইন ততই শক্তিশালী হয়ে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। আর এ শাসন যতই নিস্তেজ ও দুর্বল হবে, আইন ততখানিই অর্থহীন ও নিষ্ফল হয়ে পড়বে।

'আইনের এ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে স্থিতিশীল করার মানসে দু'টি উপকরণের প্রয়োজন। এর পয়লা উপকরণটি হচ্ছে নিছক নৈতিক ধরনের। আর সেটি হচ্ছে আইনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সেই চেতনা, যা তার অনুগতদের অন্তরে গহীন কোঠায় স্থান লাভ করে। এ চেতনার ফলেই আইনের সম্মুখে শ্রদ্ধাভরে শুধু মস্তকই অবনত হয় না বরং অন্তরও অবনত হয়ে যায়। যেখানে এ চেতনা বর্তমান পাওয়া যায়,সেখানে আইনের আনুগত্য বন্দুকের নল উঁচিয়ে করানো হয় না বরং মনের খুশিতে তাকে স্বাগতম জানিয়ে থাকে। আর এর বিরোধিতাকে তখন পাপের কাজ ও নৈতিক অপরাধ ভাবা হয়। সমাজ জীবনে এ মনোজ্ঞ অবস্থার সৃষ্টি তখন পর্যন্ত হতে পারে না যখন পর্যন্ত আইনের ভিত্তিপ্রস্তর এমন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার উপর না করা হয়, যার উপর সাধারণ জনতার ঈমান রয়েছে। অথবা এমন মৌলিক নীতিমালার উপর না করা হয়, যার প্রতি মানুষ অন্তরের অন্তস্থল হতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। আইনের শাসনের দ্বিতীয় উপকরণটি হচ্ছে সেই জোর-জবরদস্তি, যা আইন প্রয়োগেরও কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়। এটা মূলত এমন একটি বাহ্যিক উপাদান বিশেষ যাতে স্বীয় কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য আইন প্রণয়নকারী ও শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এর মধ্যে আইন অমান্যকারীদের উপর প্রয়োগকৃত দণ্ড ও শাস্তির বিধানগুলোও শামিল রয়েছে।

আইনের প্রকরণ

আইনের প্রকারভেদ

সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিক প্রকারভেদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি আমরা পৃথিবীর আইন ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাই তাহলে আমরা কয়েকটি আইনের কাঠামো দেখতে পাই। এক. যার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এক কথায় সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার উপকরণ কার্যকর থাকে। এ ধরনের আইন স্থিতিশীলতা ও উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করার সুন্দরতম পথ। সমাজের উপর এর প্রভাব-প্রতিপত্তি অসীম। এ ধরনের আইন যেহেতু জনতার প্রাণের প্রতিধ্বনি এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও দর্শন, ধ্যান-ধারণার সঠিক মুখপাত্র, সেহেতু বাহ্যিক জগতের সাথে সাথে মানুষের অন্তর জগতের উপরও এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ আমাদের নিকট যে দাবি পেশ করে আইনও সেই একই দাবি পেশ করে। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই এ ধরনের আইনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়। আমরা যদি এ ধরনের আইনের চাহিদা পূরণ করতে পারি, তবে আমাদের মন অনন্ত প্রশান্তি লাভ করে।

তাহলে এ ধরনের আইনের সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে ইসলামী আইন। যদিও মানব রচিত কিছুসংখ্যক আইন নিঃসন্দেহে এ ধরনের আইনের মধ্যে গণ্য হয় বটে,কিন্তু মানব রচিত আইন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের মধ্যে মৌলিকভাবে এমন কিছু বৈপরীত্য রয়েছে যার ফলে মানব রচিত আইনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের সাথে তুলনা করা যায় না।

মানব রচিত আইন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন

শরীয়তী আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এর মধ্যে এমন একটি আধ্যাত্মিক উপাদান রয়েছে যা মানব রচিত আইনে নেই। শরীয়তের প্রতিটি আইনই ইসলামী শিক্ষার কোন না কোনটির উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ভরশীল। ইসলাম প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য আখলাক, রীতি-নীতি এক কথায় যাবতীয় সম্পর্ককে আপন আদর্শে গড়ে তোলে। মুসলমানদের ঈমান

আকিদার সাথে শরীয়তী আইনের যেমনি একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তেমনি তাদের মন-প্রাণও এ আইনের প্রভাব ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রবিশেষ। অপরদিকে মানব রচিত আইনের দু-একটির ভিত্তি যদিও বা ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ,তথাপি এর তুলনায় হাজারো আইনের ভিত্তি হয়েছে শাসক ও আইন প্রণেতাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। ইউরোপের সকল আইনের উৎস হচ্ছে রোমান 'ল'। ইউরোপীয়রা খৃস্টান ধর্মমত গ্রহণ করার বহু পূর্বেই রোমান আইন অনুসরণ করেছিল। এ ছাড়া খৃস্টান ধর্মমত যখন উন্নতির শীর্ষে উপনীত হয়েছিল তখন তারা ইয়াহূদী ধর্মমতকে পরিত্যাগ করেছিল। এর ফলে আইনের উপর ধর্মের সঠিক ও উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাবই ছিল না। আইন কাঠামোর সাথে নামস্বরূপ এমন কিছু পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছিল, যা ধর্মের নাম উচ্চারণ করা এবং রাষ্ট্র ধর্মবাদীদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধে করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

শরীয়তী আইনের বৈশিষ্ট্য

শরীয়তী আইনের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে মানুষের সৎ গুণাবলীর হিফাযত ও তার ক্রমবিকাশের জন্য সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করা। শরীয়ত তার এ মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এতখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকে যে, দু'টি নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিটিকেই সে ধ্বংসের এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের সাথে যদি কোন বস্তুর অতি ক্ষীণতম সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে তবে শরীয়তী আইন সে ব্যাপারে তৎক্ষণাৎই তার ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু মানব রচিত আইনগুলো নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের ব্যাপারে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখে না। কোন ব্যক্তির অশুভ তৎপরতা ও চরিত্রহীন কার্যাবলী যতক্ষণ অন্য কোন লোকের ক্ষতি সাধন না করে এবং সমাজ-জীবনের শাসন শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ এ আইন ব্যক্তির কার্যাবলীর প্রতি নিরব দর্শকের ভূমিকাই নয় বরং তা নিরাপত্তার ভূমিকায় তৎপর থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বর্তমান প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার শুধু তখনই অপরাধের কাজ যখন কোন এক পক্ষের উপর জবরদস্তি করা হয়। অর্থাৎ এখানে ব্যভিচারী আসল অপরাধ নয়; বরং জবরদস্তি

করাটা হচ্ছে অপরাধ। কারো ধন-সম্পদের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা যেমন অপরাধ, তেমনি অন্যায়ভাবে তার সম্মানের ও সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করাও অপরাধ। কিন্তু পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে যেমন একজনার সম্পদ অপরের জন্য বৈধ হয়ে যায় তেমনি মানব রচিত আইনের দৃষ্টিতে দু'পক্ষের সম্মতিতে এ সতীত্বহানিও বৈধ হয়ে যায়। আর এহেন পারস্পরিক সম্মতি অবস্থায় মানব রচিত আইন ব্যভিচারের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার নিরাপত্তা বিধানকারীতে পরিণত হয়। যদি তৃতীয় কোন লোক এ কুকাজে বাধা প্রদান করে ,তখন আইন চক্ষু তাকে শাসাতে থাকে। কিন্তু শরীয়তী আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার সর্ব অবস্থায় হারাম ও অবৈধ। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারী এমন এক মারাত্মক অপরাধ, যা সমাজের নৈতিক চরিত্রের মূল শিকড়টিকেই কেটে দেয়। আর নৈতিক চরিত্রের জগতেই যখন নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তখন সমগ্র সমাজের ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়ে। এমনিভাবে মদ্যপান মানব রচিত আইনের দৃষ্টিতে কোন অপরাধের কাজ নয় এবং এর ফলে সৃষ্ট পাগলামী ও মাতলামীও ধর্তব্য অপরাধ নয়। অবশ্য মাতলামী অবস্থায় যদি কাউকে গালিগালাজ বা মারপিট করে অথবা সে জনসাধারণের মধ্যে এমনভাবে চলতে থাকে যাতে তাদের অসুবিধা সৃষ্টি হয়, কেবল এহেন অবস্থায়ই আইন হস্তক্ষেপ করে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে মদ্যপানকারী এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের লোকজনের নৈতিক, চারিত্রিক, আর্থিক, দৈহিক ও মানবিক ক্ষতি সাধন হয় তা বন্ধ করার জন্য মানব রচিত আইন আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনাই করে না। কিন্তু শরীয়ত মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করে। এর দ্বারা মাতলামী সৃষ্টি হোক বা না হোক, সর্ব অবস্থায় মদের ক্রয়-বিক্রয় ও পানাহার হারাম। কেননা শরীয়ত এ ব্যাপারে শান্তি ও অশান্তিকে একটি সংকুচিত ও সীমায়িত দৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করে না। এটাকে সে বিশাল ও উদার দৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করে। তার দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে চরিত্রের সংরক্ষণ। এখানে চরিত্র ও নৈতিকতাকে মৌল ভিত্তি এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, এ আইনের উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন। আর দীন সর্বাবস্থায়ই সচ্চরিত্রের জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং একটি উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠাকে নিজের সব লক্ষ্যবিন্দু নিরূপণ করে থাকে। যেহেতু দীনের মধ্যে পরিবর্তন ও রদবদলের কোন অবকাশ নেই,

সেহেতু চরিত্র ও নৈতিকতার সাথে শরীয়তী আইনের সম্পর্ক হচ্ছে নিবিড় ও চিরস্থায়ী।

বর্তমান যুগের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে চরিত্র ও নৈতিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কারণ এ আইনগুলোর মধ্যে দু'একটা আইন এমনও রয়েছে যা ধর্মের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ আইনগুলোর লক্ষ্য আল্লাহ্র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়, আর দীনী আকীদার উপরও এর ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়নি; বরং বাস্তব ঘটনাবলী, সামাজিক প্রথা এবং সাধারণ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতির উপরই এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের আইন পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও সংস্কার এ ধরনের আইনের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। জনসাধারণ, শাসকবর্গ, সমাজ নেতা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের অভ্যাস, প্রয়োজন ও কল্যাণকামিতার দিকটি যখন পরিবর্তনশীল, তখন আইনও এদের বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে বাধ্য। এ ধরনের আইনের প্রণেতাগণ মানবিক দুর্বলতামুক্ত নয়। অপরদিকে তারা নিজেদের কার্যাবলীকেও নৈতিক চরিত্রের অক্টোপাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এসব আইনের মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক উপাদানের কার্যকারিতা দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতেই থাকে। এমনকি তারা এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, এ সব আইনের পতাকাবাহিগণ গৌরবের সাথে ঘোষণা করে যে, আমাদের আইন হচ্ছে ধর্মহীন আইন। এ পর্যায়ে আইনের মধ্যে তখন নৈতিক ও চারিত্রিক নীতিমালা—মূল্যহীন বা সেচ্ছাপ্রণোদিত রূপ পরিগ্রহ করে থাকে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বাধ্যবাধকতার ধারক-বাহক আইন অচল হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ শাসন প্রণালীই এহেন উন্নতির লক্ষ্যবিন্দুতে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –

একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয়।

তিনি আল কুরআনে আর এক স্থানে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ –

যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সে জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট কখনই গ্রহণীয় হবে না।

—সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

শরীয়তী আইনের উৎসমূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্তা। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইনের উৎসমূল হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। এর ফলে এই হয় যে, শরীয়তী আইনের প্রতি রাজা-প্রজা,শাসক ও শাসিত সকলেই মন-প্রাণ দিয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এ আইনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে যদি পূরণ করা হয় তবে এ পার্থিব জগতে যেমন সাফল্যময় জীবন-যাপন করার সৌভাগ্য হবে তেমনি সৌভাগ্য লাভ হবে পরকালেও। আর এর বিরোধিতা দ্বারা যেমন ইহকাল হবে অপমানজনক তেমনি পরকালও হবে চরম অবমাননাকর।

মানব রচিত আইনের সাফল্যের একটি বিরাট মানদণ্ড এই মনে করা হয় যে, কোন না কোন একটি সীমা পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে এর প্রতি আনুগত্যের মনোভাব উজ্জীবিত থাকে। সুতরাং এ মানদণ্ডে যদি দুনিয়ার কোন আইনকে পরিমাপ করা হয় তবে শরীয়তের আইনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোন আইন আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অপরদিকে মানব রচিত আইনের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শাসকবর্গের পরিবর্তন হবার ফলে এ ধরনের আইন অপ্রয়োজনীয় হতে পারে এবং জনতার লোভ-লালসায় পর্যবসিত হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়তী আইন এ ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। জগতের অধিকাংশ দেশেই এ ব্যাধিটির সাধারণ প্রচলন হয়ে গেছে যে, বিরোধী দলের লোকেরা যখন সরকারী দলের সমালোচনা করে তখন তাদের প্রণীত আইনগুলোকেই অভিযোগ ও ভর্ৎসনার বিষাক্ত তীর নিক্ষেপের অভিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। আর বিরোধীদল সরকারী দলের আইনের তুলনায় নতুন আইনের নকশা তুলে ধরে জনসাধারণকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, আমরা সরকারের জনবিরোধী আইনকে উৎখাত করে আমাদের এই কল্যাণমুখী আইন প্রবর্তন করবো। বিরোধীদলের সদস্যরা এহেন গতিধারা গ্রহণে তাদের সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তবতার প্রতীক বলে ভাবতে থাকে। কেননা তারা জ্ঞাত আছে যে, আমরা যে আইনের বিরোধিতা করছি এবং যাকে বাতিল করার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাও ভুল-ভ্রান্তির শিকার মানুষেরই মস্তিষ্কপ্রসূত আইন। পাশ্চাত্যের

অধিকাংশ দেশে আইনের গৌরব ও মহত্ত্বের উজ্জ্বল দিবাকরটি অস্তমিত হবার পথে। সেদিন দূরেও নয়, যেদিন এহেন মানব রচিত আইনের গৌরব সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

শুধু কল্যাণকর ভিত্তির উপর যে আইনের কাঠামো রচিত হয়, তা কখনই ব্যক্তি ও সমষ্টির কাছে চিরস্থায়ী সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে না। ব্যক্তি ও সমষ্টি যখন একথা অনুভব করতে থাকে যে, আইন তাদের কল্যাণ ও উপকারের অনুকূলে কাজ করছে, তখন তারা তার সম্মুখে শ্রদ্ধাবণত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তারা একে তাদের স্বার্থের অনুকূলে না পায় বরং প্রতিকূলে দেখতে পায় তখন তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ আইনের অবস্থা হচ্ছে যে, ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাসের সাথে আদৌ সম্পর্কই রাখে না। বরং এর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য।

শরীয়তের নামে অযোগ্যতার অপবাদ

বহুদিন যাবৎ শরীয়ত সম্পর্কে লেখাপড়া করার পর আমি অনুধাবন করতে পেরেছি যে, যারা শরীয়তকে বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণের অযোগ্য মনে করে তাদের এ মতবাদ কোন যুক্তি-গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়েই শরীয়তী আইন মানব রচিত আইনের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। একে শুধু বর্তমান যুগেরই নয় বরং ভবিষ্যতের অবস্থা পরিবেশ ও তার চাহিদা পূরণের যোগ্য বলা যেতে পারে।

যারা শরীয়তের নামে অযোগ্যতার অপবাদ চাপিয়ে দেয়, তারা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত। প্রথম গ্রুপে রয়েছেন সেই সকল লোক, যারা যেমন না করেছে শরীয়তের জ্ঞান লাভ, তেমনি আইন সম্পর্কেও কোন জ্ঞান তাদের নেই। আর দ্বিতীয় গ্রুপের লোক হলো তারা, যারা আইন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হলেও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত। মোট- কথা, উভয়শ্রেণীই শরীয়ত ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং এহেন অজ্ঞতার মধ্যে অবস্থান করে শরীয়ত সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা এবং সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আদৌ তাদের নেই। কেননা, কোন বিষয়ে ওয়াকিবহাল না হয়ে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা যেতে পারে না।

শরীয়ত সম্পর্কে যারা কিছু জ্ঞান রাখে, তারা তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি একটি ভ্রান্ত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের এ মতামত যে নিয়মিত জ্ঞান-গবেষণার পর সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, তারা জানতে পেরেছে যে, বর্তমান যুগের আইন অষ্টাদশ শতাব্দীরই আইন নয় বরং উনবিংশ শতাব্দীর আইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও এদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। তারা এ কথাও অবহিত হতে পেরেছে যে, বর্তমানকালের আইন বৈজ্ঞানিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বের এমন মৌলিক ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যার কোন অস্তিত্বই প্রাচীন আইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আইনের এ দু'টি প্রকরণের তুলনামূলক গবেষণা দ্বারা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রাচীনকালের আইন বর্তমান যুগের অযোগ্য। এ মতামত সত্য ও সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোন কথা নেই। কিন্তু এর পর যখন তার শরীয়তী আইনকে মানব রচিত আইনের উপর কিয়াস করে, তখনই তারা কঠোরভাবে আঘাত পায় এবং মূল সত্য হতে বহু দূরে সরে পড়ে। তারা এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আইনগুলো যখন বর্তমান যুগে অযোগ্য তখন শরীয়তী আইন সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। কারণ তা চৌদ্দশো বছর পূর্বে জন্ম নিয়েছে এবং মধ্যযুগ পর্যন্ত তা প্রচলিত ছিল। আর তার কোন কোন আইন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রচলিতও ছিল। এহেন ভ্রান্ত অনুমান ও উল্টো যুক্তিই হচ্ছে তাঁদের ভিত্তিহীন প্রমাণ।

শরীয়তের উপর মানব রচিত আইনকে কিয়াস করা ভুল

এ কিয়াস ও অনুমানের ভুল হলো, তারা মানব রচিত আইন ও শরীয়তকে একই মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। অথচ মানব রচিত আইন হচ্ছে মানব মস্তিষ্কপ্রসূত আর শরীয়তী আইন 'রচনার দায়িত্ব খোদ আল্লাহ্ তা'আলার। তাদের এ কিয়াসের অর্থ হচ্ছে পৃথিবীকে আকাশের সাথে এবং সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টিকুলের সাথে তুলনা করা। একজন বিবেকবান লোকের পক্ষে কোন মতেই ইহা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে, সে নিজেকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর এবং পৃথিবীকে আকাশের উপর কিয়াস করবে। এরা শরীয়তী আইন ও মানব রচিত আইনকে একই শ্রেণীভুক্ত করে। অথচ এ দু'টি আইন প্রকৃতির দিক দিয়ে পরস্পর ভিন্ন, একের সাথে অপরের কোনই সম্বন্ধ নেই।

দু'টি ভিন্নমুখী বিষয়ের মধ্যে কিয়াস অসম্ভব

শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং এদের মধ্যে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে পরস্পর পার্থক্য হতে বাধ্য। তাই এদের মধ্যে কিয়াস কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ কিয়াসের নিয়ম হচ্ছে যে, যাকে কিয়াস করা হয় এবং যার উপর করা হয় উভয় সমমানের হতে হবে। না হলে কিয়াস করা সম্ভব নয়, করা হলেও সে কিয়াস বাতিল বলে গণ্য হবে।

যারা শরীয়তকে বর্তমান যুগে অযোগ্য মনে করে তারা শরীয়তকে মানব রচিত আইনের উপর কিয়াস করেই এ মতবাদ প্রকাশ করেছে। অথচ শরীয়ত ও মানব রচিত আইন সমমানের নয়। এ কারণেই তাদের এ কিয়াস বাতিল বলে গণ্য। আর বাতিলের উপর কিয়াসের ভিত্তি করে যে দাবি পেশ করা হয় সে দাবিও বাতিল।

আমরা আইন ও শরীয়তের ক্রমবিকাশের ধারা বিবরণী এবং এদের মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাবো। ফলে এদের পরস্পরের পার্থক্য নির্ণীত হবে।

মানব রচিত আইনের ক্রমবিকাশ

মানব রচিত আইন অত্যন্ত সাধারণ মর্যাদায় সীমিত নীতিমালা ও নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে এমন সমাজে জন্ম লাভ করে যে সমাজ নিজেই হচ্ছে এর রচয়িতা ও সংগঠক। অতঃপর সমাজের প্রয়োজন যত বাড়তে থাকে ও বিভিন্নমুখী হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, রীতি-নীতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্র যতই উন্নত হয় ,আইনের মধ্যেও ততই বিবর্তন আসতে থাকে। নতুন নতুন নীতি ও নিয়ম রচিত হয়, দর্শন ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়ে তা স্থিতিশীল হয়। মানব রচিত আইনকে আমরা দোলনার শিশুর সাথে তুলনা করতে পারি। শিশু প্রথমত খুব ছোট্ট ও দুর্বল থাকে, অতঃপর ক্রমান্বয়ে সে শক্তি লাভ করে বড় হতে থাকে। এমনকি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে সে ভরা যৌবনে পদার্পণ করে। মানব রচিত আইনের অবস্থাও একই রূপ। মানব রচিত আইন যে সমাজে জন্মলাভ করে, তার উন্নতিও হয় সেই সমাজেই। সমাজ যদি দ্রুত বিবর্তনশীল হয়,আইনও তখন সমাজের গতির সাথে তড়িৎ উন্নতির সোপান অতিক্রম করতে

থাকে। আর সমাজ যদি বিবর্তনের গতি হারিয়ে ফেলে তখন আইনের বিবর্তনের গতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। মানব রচিত আইন হচ্ছে সে যে সমাজে জন্মলাভ করে সেই সমাজেরই অবদান। সমাজের কাছে সর্বদাই সে ঋণী। সমাজই তাকে তার প্রয়োজনের তাগিদে জন্ম দিয়ে থাকে। আইনের উন্নতি ও বিবর্তন সবকিছুই সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। সমাজকে বাদ দিয়ে সে এক কদমও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

আইনের উৎস ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আইনবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মানবিক সমাজে পারিবারিক ও গোত্রীয় জীবনের সূচনাকাল হতেই এর সূচনা আরম্ভ হয়েছিল। এর প্রাথমিক অবস্থাটি এই ছিল যে, পরিবারের প্রধান লোকটির অথবা গোত্রের সর্দারের মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দই আইনের মর্যাদা পেত। এরপর মানুষের সামাজিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে আইনের ক্ষেত্রেও বিবর্তন দেখা দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সমাজ তার রূপ পাল্‌টিয়ে বৃহৎ আকারে রাষ্ট্রীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। যেহেতু একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সকল গোত্রের রীতি-নীতি অভিন্ন হয় না, এ কারণেই রাষ্ট্র এসব রীতি-নীতিও সংরক্ষণ করে সমস্ত লোকের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি আইন বানিয়ে নিল। কিন্তু চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও একটি রাষ্ট্রের আইন অপর রাষ্ট্রের আইনের সাথে বহু ক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়। খৃস্ট্রীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এ পার্থক্য পূর্ববতই বহাল রয়েছে। এর পর আইনের ক্ষেত্রে কিছুটা নবতর বিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শন,জ্ঞান ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার আলোকে এর উন্নতির সর্বশেষ পর্বটির সূচনাকাল আরম্ভ হয়েছে। এ শেষ পর্বটিতে আইনের ক্ষেত্রে কিছু বিরাট মৌলিক বিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং এমন আধুনিক দর্শন-এর ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বিগত যুগগুলোতে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এই আধুনিক দর্শনের জগতে সুবিচার সাম্য, সহানুভূতিশীল ও মানবতাবাদী নীতিগুলো প্রসার লাভের ফলে দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনের নীতিমালা প্রায় একইরূপ হওয়া সত্ত্বেও আমরা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি।

এই হচ্ছে আইনের ক্রমবিকাশ ও যুগে যুগে তার বিবর্তনের ধারার একটি মোটামুটি রূপরেখা। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মানব রচিত আইন তার প্রাথমিক

যুগের রূপরেখা বর্তমান যুগের রূপরেখা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন বিবর্তনের পরই বর্তমান রূপরেখায় সে উপনীত হয়েছে। এ বিবর্তন খুব স্তিমিত গতিতে হাজার হাজার বছর থেকেই চলে এসেছে।

শরীয়তী আইনের ক্রমবিকাশ

মানব রচিত আইনের বিবর্তন হতে শরীয়তী আইনের বিবর্তন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সৃষ্টি যেমন এরূপে হয়নি তেমনি এর ক্রমবিকাশও এরূপে হয়নি। শরীয়ত প্রথম অবস্থায় গুটিকয়েক সংক্ষিপ্ত নিয়ম-কানূন ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নীতিমালা ও অপূর্ব দর্শন ছিল। অতঃপর সংগঠিত হয়ে দৃঢ় হয়েছে এরূপ কখনোও ছিল না। বরং সে জন্মলগ্ন হতেই পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা একে সর্বপ্রকার বক্রতা ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন রূপ দান করে অবতীর্ণ করেছেন। একটি নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে একে ঢেলে দিয়েছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়তীর সূচনা থেকেই এর সূচনা হয় এবং তাঁর ইহধাম ত্যাগ ও আল্লাহ্ তা'আলার সেই সর্বশেষ প্রত্যাদেশের পরই এর শেষ হয়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

অদ্যকার দিন তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণ করে দিলাম এবং পূর্ণ করলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত। আর জীবন বিধানরূপে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম। —সূরা মায়িদা ঃ ৩

শরীয়তী আইন কোন সমাজ, কোন জাতি অথবা কোন সাম্রাজ্যের জন্য আসেনি। বরং তার পয়গাম সমভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য আরবী আযমী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকলের কাছেই তার আহ্বান। তাদের রীতি-নীতি ও ঐতিহাসিক অবস্থা যতই ভিন্নরূপ হোক না কেন,সকলকেই সে সম্বোধন করে থাকে। সুতরাং শরীয়তী আইন হচ্ছে প্রতিটি বংশ-পরিবার, প্রতিটি গোত্র, সম্প্রদায়, প্রতিটি

সমাজ, প্রতিটি দল ও রাষ্ট্রের জন্য। শরীয়ত এমনি একটি বিশ্বজনীন আইন, যাকে আইনবিদগণ ধারণা করতে পারেন বটে কিন্তু বাস্তবতার তুলিতে প্রকাশ করতে পারেন না।

শরীয়ত পূর্ণতার এমন উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছে যে, এর মধ্যে দোষ-ত্রুটি ও বিচ্যুতির কোনই ক্ষত নেই। এ এমনই পূর্ণাঙ্গ যে, প্রত্যেকটি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এর মধ্যে নিহিত। এ এমনই উদার ও বিরাটকায় যে, কোন অবস্থাই এর বহির্ভূত নয়। সমগ্র বিষয়কে সে নিজের আবেষ্টনীতে রেখে দিয়েছে। ব্যক্তি, সমষ্টি, দল, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ই এর মধ্যে নিহিত। সে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় শাসন-শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক তৎপরতায় নিমগ্ন থাকে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কীয় সমুদয় বিষয়কেও সংগঠিত করে। এমন কি যুদ্ধ ও শান্তি অবস্থায় রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যও তার নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও আইন রয়েছে।

শরীয়ত কোন একটি যুগ ও কালের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং সে প্রতিটি যুগ ও কালের জন্য এবং কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বযুগেই কার্যকর। শরীয়তকে ঢালাই করে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে,যুগের কোন প্রভাবই তার উপর পতিত হতে পারে না—পারে না তার নতুনত্বের মধ্যে কোনরূপ বিবর্তন সৃষ্ট হতে। তার সাধারণ নিয়ম-নীতি মৌলিক দর্শনের মধ্যে বিবর্তনতারও কোনরূপ প্রয়োজন পড়ে না। এর বিধানগুলো এমনই সাধারণ ও সর্বাঙ্গীন এবং সে এমনই স্থিতিস্থাপকতার ধারক যে, প্রতিটি সেই সৃষ্ট নব অবস্থা সম্পর্কে আগাম সমাধান দিতেও সক্ষম; যা বর্তমান অবস্থায় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ কারণেই শরীয়তের বিধানের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। মানব রচিত আইনের বিধান যেরূপ ওলট-পালট হতে থাকে , শরীয়তী আইনের বিধান তদ্রূপ কখনো ওলট-পালট হয় না। শরীয়ত ও আইনের মধ্যে এ পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে যে, শরীয়ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে, যার কালামের মধ্যে কোনই পরিবর্তন হতে পারে না।

لا تبديل لكلمات الله –

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র কালামে কোন পরিবর্তন নেই।" তিনি অদৃশ্য জগতের

মহাজ্ঞানী সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও ক্ষমতার কাছে মানুষের জন্য সর্বযুগে কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিধান দেওয়া কোনই মুশকিল কাজ নয়। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন হচ্ছে মানুষের জ্ঞানজাত ও মস্তিষ্কপ্রসূত আইন। এগুলোকে মানুষ তাদের সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে রচনা করে নেয়। ভাবীকালের জ্ঞান তাদের থাকে না। এদিক দিয়ে তাদের রচিত আইনের বিধানগুলো সেই অবস্থাকে নিজের মধ্যে আবেষ্টন করে রাখতে পারে না, যেগুলো বর্তমান অবস্থায় হবার কোন সম্ভাবনা না থাকলেও ভাবীকালে সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

মানব রচিত আইন আজ যেই নবতর দর্শনের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হতে পেরেছে, শরীয়ত শুরু হতেই সেসব নব দর্শনের ধারক ও বাহক। অথচ মানব রচিত আইন মূলত বহু প্রাচীন। শরীয়ত তার আঁচলে দর্শন ও নীতি আদর্শের এমন সব মৌল উপাদান বেঁধে রেখে দিয়েছে, যে সম্পর্কে আমাদের আইনবীদগণ কোনরূপ ধারণাই আনতে পারেন না। আমাদের আইনবেত্তাগণ যে ধরনের আদর্শ চান এবং যেগুলোর প্রতিফলন আইনের মধ্যে দেখার আকাঙ্ক্ষী, তা সবকিছুই শুরু থেকে শরীয়তের কাছে বর্তমান।

শরীয়তী আইন ও মানব রচিত আইনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই

আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, শরীয়তী আইন ও মানব রচিত আইনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই, যেমন নেই এর মধ্যে কোনরূপ মমতা। তেমনি একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করাও যেতে পারে না। শরীয়তী মেযাজ, প্রকৃতি ও গতিধারা সামগ্রিকভাবে আইনের মেযাজ ও গতি-প্রকৃতি হতে পৃথক। এদের পরস্পরের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নেই। শরীয়তের গতি-প্রকৃতি যদি মানব রচিত আইনের ন্যায় হতো তবে আমরা তাকে বর্তমান রূপরেখা হতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে পেতাম। এমতাবস্থায় গুটিকয়েক প্রাথমিক অপূর্ণ দর্শনের রূপরেখায় তার সূচনা হতো। এরপর সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে সেও মানব রচিত আইনের ন্যায় বিবর্তিত হয়ে উন্নতির সোপান অতিক্রম করতো। তাকে যেসব নব নব দর্শন ও নীতিমালার ধারক ও বাহক দেখা যাচ্ছে এবং যার বদৌলতে সে আজ মানব রচিত আইনের সম্মুখে মাথা উচুঁ করে দন্ডায়মান, তা থেকে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব থাকতো; বরং এই হতো যে, মানব রচিত আইনের

দর্শনগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে এবং তার নীতিমালাগুলোকে নিজস্ব করে নিতে হাজার বছর পথ চলার পরই তাকে তার সমপর্যায়ে দেখা যেতো।

শরীয়ত ও মানব রচিত আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পর এদের পারস্পরিক মতদ্বৈততা ও বিভিন্নতা এবং এককে অপর থেকে পার্থক্যকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের মূল বিরোধ

ইসলামী শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের সাথে মৌলিকভাবে দু'টি বিরোধ দেখা যায়।

১. আইন হচ্ছে মানব রচিত। আর শরীয়ত আল্লাহ্ কর্তৃক মানবিক আইন। এদের উভয়ের মধ্যে রচনাকারীদের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। আইন মানুষের দ্বারা রচিত হবার কারণে দুর্বলতা, অপারগতা ও সহায়হীনতার দর্শন বিশেষ। এ কারণেই সর্বদা ওলট-পালট ও পরিবর্তন- পরিবর্ধনের শিকারে পরিণত হতে থাকে। সমাজের মধ্যে যখন কোন আশাতীত বিবর্তন অথবা নবতর অবস্থার সৃষ্টি হয়,তখন তদনুযায়ী আইনও পরিবর্তন হতে থাকে। সুতরাং আইনের গতি-প্রকৃতির মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। এর রচয়িতাদের মধ্যে পূর্ণতার গুণাবলী যখন পর্যন্ত সৃষ্টি না হবে এবং সমুদয় ভবিষ্যত ঘটনাবলী ও অবস্থাসমূহকে আয়ত্তাধীন করতে না পারবে, তখন পর্যন্ত এ পূর্ণতার স্তরে উপনীত হতে পারবে না।

পক্ষান্তরে শরীয়ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী বিশেষ এবং প্রণেতার কুদরত, ক্ষমতা, মহত্ত্ব, তার পূর্ণত্ব ও মহাজ্ঞানের সাক্ষ্য বহনকারী। মহাজ্ঞানী ও মহাসাংবাদিক আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান যেরূপ প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে তদ্রূপ তাঁর রচিত শরীয়তী আইনও বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় অবস্থাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর ভেতর কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। এ কারণে স্থান-কাল-পাত্রে যতই বিবর্তন দেখা দিক না কেন, এর মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের কোনই প্রয়োজন নেই।

কতিপয় লোক এমন রয়েছে, যারা শরীয়তী আইন আল্লাহ্র পক্ষ হতে হওয়াকে কোনক্রমেই সমর্থন করে না। তাদেরকে স্বীকার করানো খুবই কঠিন।

আমি শরীয়তের যে সব গুণের কথা আলোচনা করেছি, সেগুলোর মূলতত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং এ সব গুণ শরীয়তের মধ্যে বর্তমান থাকার প্রমাণপঞ্জী তাদের সম্মুখে উপস্থিত করাই হচ্ছে তাদের সন্তুষ্টি লাভের পথ। এর পর তারা ইচ্ছে করলে মানব রচিত আইনের তুলনায় শরীয়তী আইনের মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার সর্বশেষ কি কারণ থাকতে এবং এ সব বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক শরীয়তী আইন কোন্ মহাশিল্পীর নিপুণ হাতের পূর্ণতার বিমূর্ত বিকাশ, তা-ও চিন্তা- গবেষণা করে দেখতে পারে।

শরীয়ত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আগত—এ কথার উপর যারা ঈমান রাখে তাদের জন্য এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নেওয়া কোন মুশকিল ব্যাপার নয়। এজন্য তাদের কোন জাগতিক দলীল-প্রমাণেরও প্রয়োজন করে না। এটাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে তাদের ঈমানেরই অন্যতম দাবি। আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, চন্দ্র-সূর্যের উদগাতা, পাহাড়-পর্বত আলো, বায়ু নদী-নালা, সাগর সবকিছুকে নিজের অনুগত করে রেখেছেন। উদ্ভিদ জগতের জন্ম দিয়েছেন, মাদের গর্ভে শিশুকে সৃষ্টি করে সমগ্র সৃষ্টিকুলকে এমন এক বিধানে বেধেঁ রেখেছেন, যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং যার মধ্যে পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই! এ বিষয়াবলীর প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাদের জন্য এ কথা স্বীকার করে নেওয়া কিছুই মুশকিলের কথা নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু অপরিবর্তনীয় আইন রচনা করে দিয়েছেন যা সমগ্র বস্তুজগতে ব্যাপ্ত। আর এ আইন পূর্ণতার এমন সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছে যা মানুষের ধারণার অতীত। তারা এ কথাও স্বীকার করে নেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে পূর্ণতা বিদ্যমান। তারা এ সত্যটির প্রতিও মনের আগ্রহে ঈমান আনবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তী আইনকে জনগণ, দল, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন-শৃঙ্খলার জন্য একটি অপরিবর্তনীয় পূর্ণাঙ্গ আইনের মর্যাদা দিয়ে রচনা করেছেন, যেন এর আলোকেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে তাদের জীবন সুন্দররূপে গড়ে উঠে। সুতরাং শরীয়তী আইনের পূর্ণতার বিষয়টি যে মানুষের ধারণাতীত বিষয়, সে কথা কোন মু'মিন ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট নয়।

এ বিষয়গুলো স্বীকার করে নেওয়ার পরও যদি শুধু সন্তুষ্টির জন্য কোন লোক

এর দলীল-প্রমাণের প্রত্যাশী হয়, তবে আশা করি সে যথাস্থানে তার সঠিক প্রমাণ পেয়ে যাবে।

২. মানব রচিত আইন দ্বারা এমন সমসাময়িক আইন ও নিয়ম-কানূনের কথা বোঝান হয়েছে, যেগুলো সমাজ নিজেই নিজের প্রয়োজনের তাগিদে এবং আদান-প্রদানের সাংগঠনিক শৃঙ্খলার জন্য রচনা করে নিয়েছে। সুতরাং আইন হচ্ছে এমন নিয়ম-পদ্ধতির নাম বা সমাজের অনুগত। অর্থাৎ এ আইন যদি বর্তমান সমাজের মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে, তবে আগামী দিনও তাকে সমাজের অবস্থায় বহু পিছনে থাকতে দেখা যাবে। সমাজের তাল সামলিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম হবে না। কারণ আইন ততটা দ্রুততার সাথে পরিবর্তন হতে পারে না, যত দ্রুত সমাজে বিবর্তন দেখা দেয়। সংক্ষিপ্ত কথায় মানব রচিত আইন হচ্ছে সমসাময়িক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী আইন। সমাজের অবস্থায় যখন বিবর্তন দেখা দেয়, তখন মানব রচিত আইনের মধ্যে বিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে শরীয়ত হচ্ছে এমন আইনের নাম, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্যে রচনা করে দিয়েছেন। এগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বাবস্থায় ফলপ্রসূ আইন। শরীয়ত ও মানব রচিত আইন উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সংগঠন—এদিক দিয়ে উভয়ই ঐকমত্য পোষণ করে বটে, কিন্তু একটু সম্মুখে অগ্রসর হলেই এদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। মানব রচিত আইন সমসাময়িক ও আশু প্রয়োজন মেটানোর অস্থায়ী বস্তু হলে এর বিপরীত শরীয়ত হচ্ছে একটি চিরন্তনী নীতি। শরীয়তের এ মহান বৈশিষ্ট্য যুক্তিগতভাবেই এই দাবি পোষণ করে থাকে।

১. শরীয়তী আইনের মধ্যে এমন বিশ্বজনীনতা রয়েছে যে, যতই যুগের পর যুগ অতিবাহিত হোক, বিবর্তন আসুক, মানুষের প্রয়োজন যতই বিভিন্নমুখী হোক না কেন, তা সর্বদাই ফলপ্রসূ ও সমাজের দাবি মেটাতে সক্ষম থাকবে।

২. শরীয়তের আইন মহত্তের এমন উচ্চ শিখরে অবস্থান করছে যা যে কোন যুগে ও যে কোন কালেই সমাজের অবস্থা ও তার মানের পিছনে পড়ে থাকবে না।

যুক্তির আলোকে এসব যা কিছুই হওয়া বাঞ্জনীয় মূলত বাস্তব ক্ষেত্রেও তা বর্তমান। বরং ইসলামী শরীয়তের এটাই হচ্ছে মহান বৈশিষ্ট্য যে, সমগ্র আসমানী ও ঐশী শরীয়ত ও মানব রচিত আইন হতে তাকে মহিমান্বিত করে তোলে। ইসলামী বিধানসমূহ ব্যাপকতার সর্বশেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছে এবং এর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা চূড়ান্তরূপে বিরাজমান। এ ছাড়া এর মধ্যে প্রগতির এমন উচ্চাসন নিহিত রয়েছে যার চেয়ে প্রগতির কল্পনা মানুষের মস্তিষ্কে আসতে পারে না।

শরীয়তী আইনের উপর থেকে তেরটি শতাব্দীর অধিককাল সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এ সময় বহুবারই সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। জ্ঞান ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বহুবিধ বিবর্তন এসেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জগতে এমন সব বিষয় ও বস্তুর অবতারণ হয়েছে মানুষ যার কল্পনাও করতে পারে না। এসব নবতর অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চালিয়ে নেওয়ার জন্য মানব রচিত আইন ও তার বিধানসমূহকে এত পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে যে, শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার কালের আইন ও আজকের মানব রচিত আইনের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। এতসব কিছু অবস্থা ও বাস্তব ঘটনাবলী সত্ত্বেও শরীয়তী আইনের মধ্যে কোনই বিবর্তন আসেনি,আসতে পারেও না। এ বস্তুবাদী যুগেও শরীয়তী আইনের বিধানসমূহ ও নিয়ম-কানূন সমাজের মানদণ্ডের তুলনায় বহু উর্ধ্বে অবস্থিত ও বহু উন্নত। সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধান, সংগঠন ও তার প্রয়োজন পূরণের সর্ব সুন্দর মাধ্যম মানবিক স্বভাবের সাথে অত্যধিক নিকটতম সম্বন্ধ রক্ষাকারী এবং দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা এর তুলনায় কোন আইনই দিতে পারে না।

শরীয়তী আইনের পক্ষে এগুলো হচ্ছে ঐতিহাসিক স্বাক্ষী—এর চেয়েও উজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হলে স্বয়ং শরীয়তী আইনের বিধানসমূহের পর্যলোচনা করুন। তবে আপনি মূল সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। পবিত্র কালামে মজিদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ –

তারা পরস্পরে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সমস্যার সুরাহা করে থাকে। —সূরা শুরা ঃ ৩৮

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لا ضرر ولا ضراز فی الاسلام –

অপরের ক্ষতি করা—এমনকি স্বয়ং নিজের ক্ষতি করাও ইসলামে বৈধ নয়।

কুরআন-সুন্নাহর এসব ঘোষণার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতা আমাদের কাছে ধরা দেয়। এর ভিতর নিহিত রয়েছে যে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক অবস্থায়ই তা কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আল-কুরআনের এ ঘোষণার আলোকেই শুরা নীতিকে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি নিরূপণ করা হয়েছে। এ নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা যেমন রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যবস্থাপনার কোন ক্ষতি সাধন হবে না, তেমনি জনগণ ও সমাজের স্বার্থেরও কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। শুরা এহেন নীতি এবং তার এহেন গুণাবলী শরীয়তী আইনের এমন মহত্ত্বতারই প্রমাণ বহন করে যেখানে কোন মানব মস্তিষ্কের উপনীত হওয়া কোন যুগেরই সম্ভব নয়।

আমরা যদি শরীয়তের ঘোষণা ও বিধানসমূহকে এক-একটি করে পর্যালোচনা করি তবে সবগুলিকেই আমরা সর্বব্যাপী, সার্বজনীন উন্নতি ও প্রগতিবাদের মহান আদর্শের ধারকরূপে পাবো। এর প্রতিটি ঘোষণা জগতে উদাহরণ পেশ করার যোগ্য। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ –

স্বীয় প্রভুর পথে কৌশল ও সুন্দরতম নসীহত দ্বারা ডাকো। আর ওদের সাথে সৌজন্যতার সাথে বাকযুদ্ধ করো। —সূরা নাহল ঃ ১২৫

আল-কুরআনের এ ঘোষণার মধ্যে কতখানি উদারতা, সার্বজনীনতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং কিরূপ চিরন্তনতা বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের জন্য যে নীতি ও কর্মপদ্ধতি এ ঘোষণার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তার চেয়ে কি

কোন উত্তম নীতির কথা ধারণা করা যেতে পারে ? মানব মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান কি হিকমত-কৌশল, সুন্দর নসীহত এবং সর্বোত্তম পন্থায় বাকযুদ্ধ করার পদ্ধতির তুলনায় কোন উত্তম নীতি দান করতে পারে ?

এরপর আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

কোন লোককে অপরের দায়-দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হবে না।

—সূরা ফাতিরঃ ১৮

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ তা'আলা কারো উপর তার ক্ষমতার বহির্ভূত দায়িত্ব চাপান না।

—সূরা বাকারা ঃ ২৮৬

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ -

আল্লাহ তা'আলা সুবিচার ও কল্যাণ করার এবং নিকটতম লোকদেরকে দেওয়ার হুকুম দেন। আর অশ্লীল, অন্যায় ও বিদ্রোহ না করার হুকুম করেন। —সূরা নাহল ঃ ৯০

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

আল্লাহ তা'আলা আমানতকে তার যথাস্থানে ও পাত্রে পৌছে দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেন। আর তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করলে, তা ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতে করো। —সূরা নিসা ঃ ৫৮

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا - اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

কোন সম্প্রদায় বা কোন জাতির শত্রুতা করতে গিয়ে তোমরা এমন অপরাধী হয়ো না যে, তোমরা সুবিচারের কথা ভুলে যাও। তোমরা সুবিচার করতে থাকো। কেননা এ কাজ তাকওয়ার নিকটবর্তী কাজ। —সূরা মায়িদা ঃ ৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

হে ঈমানদারগণ! সুবিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহ্‌র পক্ষে স্বাক্ষী হও—যদি তা তোমাদের বা তোমাদের পিতামাতার অথবা তোমাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষেও হয়। —সূরা নিসা ঃ ১৩৫

আল-কুরআনের উল্লিখিত এ সব ঘোষণাই নয়—বরং এর মধ্যে এমন সব মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা রয়েছে। তার সমুদয় ঘোষণার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সার্বজনীনতা পরিলক্ষিত হবে।

৩. আইনের প্রণয়নকারী হচ্ছে সমাজ। সে তার প্রথা, গতানুগতিক ধারা এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকার রং এর তুলি দ্বারা একে অঙ্কিত করে। এর মূল কথা হচ্ছে যে, তাকে সমাজের ব্যবহারিক জীবনকে সংগঠিত করার জন্যই প্রণয়ন করা হয়। সমাজকে পথ প্রদর্শন করা এবং তার বিশ্লেষণ করা এর উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে আইনকে সমাজের আনুগত্য এবং তার বিবর্তনের তাবেদার হয়ে থাকতে হয়। অপর কথায় আইন সমাজ দ্বারাই রচিত হয়, সমাজ কখনো আইনের দ্বারা রচিত হয় না।

প্রথমত আইনের ভিত্তি এটাই ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতেই এর ভিতর বিবর্তনের সূচনা হয়েছে। আর যে রাষ্ট্রগুলো বিশেষ বিশেষ আন্দোলনের পুরোধা ছিল এবং জগতবাসীর সম্মুখে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা উত্থাপন করে আসছিল তারাও আইন থেকে পথ প্রদর্শন লাভ করেছিল এবং নিজেদের বিশেষ গরজ ও স্বার্থের অনুকূলে একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিল। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এরপর ফ্যাসিবাদী ইটালী ও নাৎসীবাদী জার্মানী এ ধারাটিকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর অন্য রাষ্ট্রগুলোও ক্রমাগতভাবে একাজে হাত দিয়েছিল। সুতরাং এখন সমাজের ব্যবহারিক জীবনের সংগঠন ছাড়াও ক্ষমতাসীন

শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক জনসাধারণকে পথ প্রদর্শন করা এবং তাদের বিশ্লেষণ করাও আইনের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু শরীয়ত সম্পর্কে আমরা জানি যে, এ যেমন সমাজ দ্বারা সৃষ্ট নয়, তেমনি মানব রচিত আইনের ন্যায় সমাজের বিবর্তনের অনিবার্য ফলও নয়। বরং সুনিপুণ হস্তের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট। আর শরীয়তী আইন মানব রচিত আইনের ন্যায় সমাজের ব্যবহারিক জীবনের সংগঠন ও শৃঙ্খলার জন্যও রচনা করা হয়নি। বরং শরীয়তের সর্ব প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে পুণ্যবান লোক, পুণ্যবান সমাজ সৃষ্টি করা এবং একটি উত্তম রাষ্ট্র সংগঠিত করা। এ কারণেই তার ঘোষণাবলী তৎকালীন ও তার মানের তুলনায়ই শুধু মহৎ ও উন্নত নয় বরং বর্তমান জগতের চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে। এর ঘোষণাবলীর মধ্যে এমন সব দর্শন ও নীতিমালা পেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী পথ চলার পরই অনৈসলামী জগতে পৌঁছতে সক্ষম হতে পারে। বরং এর মধ্যে এমন সব মানব কল্যাণধর্মী দর্শন বিবৃত হয়েছে যে পর্যন্ত জগতের মস্তিষ্কে আজও পৌঁছতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর প্রণয়নের দায়িত্ব বহন করুক এটাই ছিল শরীয়তের স্বাভাবিক দাবি। সুতরাং তিনি পূর্ণরূপেই তার রসূলের কাছে অবতীর্ণ করলেন। মানুষের কাছে এর আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া এবং শরীয়তের দাবি মাফিক উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতার উচ্চমার্গে পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর দায়িত্বে পরিণত হল। শরীয়ত তার এ মিশন ও উদ্দেশ্যকে খুব সুন্দররূপে সম্পাদন করে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাকে পূর্ণতার রূপ দিয়েছিল। তিনি মরু বালুকার ছন্নছাড়া বেদুঈনদের জগতের পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করলেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে মানবতার শিক্ষক ও পথ প্রদর্শনের মর্যাদায় সমুন্নত করলেন।

মুসলমানগণ যতদিন শরীয়তকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলেছে, শরীয়তও ততোদিন তার নিয়ামত ভোগ করিয়ে তাদেরকে সৌভাগ্যশীল করেছে। তারা শরীয়তকে নিজেদের কর্মময় জীবনের নীতিরূপে গ্রহণ করে নিয়ে সাফল্যের জয়টীকা বহন করে চলেছে। প্রথম যুগের মুসলমানগণ একে নিজস্ব করে নেওয়ার ফলেই সংখ্যায় অতি অল্প ও দুশমনের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত রয়েও বিশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নীচুতা-হীনতাকে পরাজিত করে উন্নত হয়ে

সমগ্র জগতের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও মানবতার পথ প্রদর্শনের আসনটি অলংকৃত করেছিল। অর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে কোথাও তাদের নাম-নিশানাও ছিল না। কিন্তু শরীয়তের বদৌলতে চতুর্দিকে তাদের কথাই উচ্চারণ হতে লাগলো। সবদিকে তাদের নামের জয়ধ্বনিতে বিশ্ব মুখরিত হয়ে উঠলো। এ সব শরীয়তেরই অবদান। শিষ্টাচারের সাথে পরিচিত করিয়েছে, অনুভূতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের উন্মোচন করে দিয়েছে, মান-সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছে। পূর্ণাঙ্গ সাম্য ও সুবিচারের পরিবেশ ও পরিমন্ডল সৃষ্টি করে দিয়েছে। কল্যাণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোদিতাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। অন্যায় থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অজ্ঞানতা ও স্বার্থপরায়ণতার তিমির হতে বের করে চিন্তার স্বাধীনতা দান করেছে। তাদের সম্যক বুঝিয়ে দিয়েছে যে, 'আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধই হচ্ছে তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও ঈমানের অলংকারে সুসজ্জিত হয়েই তাদের এ কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষের কাছে এই পয়গাম তুলে ধরতে হবে।

যখন পর্যন্ত শরীয়তের সাথে মুসলমানদের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান ছিল তখন পর্যন্ত তাদের অবস্থা এরূপই ছিল। কিন্তু যখনই তারা শরীয়তকে ছেড়ে দিল তখনই তারা তাদের সম্মানের আসন হারিয়ে ফেললো। উন্নতি ও সাফল্যের মহাতোরণে উপস্থিত থাকার পরও তারা আবার সেই অন্ধকার তিমিরে চলে গেল, যেই তিমিরে তারা বহুকাল ধরে আবদ্ধ রয়ে নানাবিধ জুলুম-অত্যাচার ও শোষণ-পেষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল।

নীচুতা-হীনতা ও অবনতির এহেন চরম অবস্থায় তাদের দৃষ্টি চলে গেল ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে। তাদের জাগতিক উন্নতি দ্বারা এদের চোখ ঝলসিয়ে গেল। তারা মনে করে নিল যে, ইউরোপীয়দের আদর্শ নীতি ও আইন-কানূনের মধ্যেই ইউরোপীয়দের জাগতিক উন্নতির রহস্য নিহিত। সুতরাং তারা ইউরোপীয়দের সকল ক্ষেত্রে তাদের অন্ধ অনুকরণ শুরু করে দিল এবং নিজেদের সকল ক্ষেত্রে তাদের ন্যায় ঢালাই করে সাজিয়ে গড়ে তুলতে চাইল। কিন্তু এটা তাদের রোগের চিকিৎসা ছিল না; বরং এটা ছিল উল্টো তাদের রোগ বাড়াবার নোসখা। সুতরাং এহেন ভ্রান্ত অন্ধ অনুকরণের ফলে

তারা নীচুতা- হীনতা, গুমরাহী অবমাননা ও দুর্বলতার সাথে সাথে খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়লো। বিভিন্ন গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রতিটি সম্প্রদায় ও জাতিই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অপরের চিন্তা মনের কোণেও স্থান দিল না। অতঃপর এদের মধ্যে এমন অবস্থা দেখা দিল যে, আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

تحسبوا هم جميعا وقلوبهم شتى -

'আপনি তাদেরকে একত্রিত ভাবছেন অথচ তাদের অন্তকরণ আলাদা (এর দৃশ্য ভেসে উঠলো)।'

মুসলমানদের যদি আজ শুভ দিন থাকতো তবে এই সত্যটি তাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকতো না যে, শরীয়ত সবদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। তার ভান্ডারে উন্নত সমাজ গঠনের সর্বপ্রকার নীতি আদর্শ ও আইন-কানূন বর্তমান রয়েছে। জাতির উন্নতি-অবনতি সকল অবস্থায়ই একমাত্র শরীয়তই তাদের জন্য নির্ভুল কর্ম পদ্ধতি এবং উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পারে। কেননা একটি পুণ্যময় সমাজ গঠন করে উত্তরোত্তর উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুসলমানদের ইতিহাসে তাদের জন্য নসীহত ও শিক্ষা গ্রহণের বহু মাল-মসলা মওজুদ রয়েছে। শরীয়তেই যে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র সঞ্জীবনী, অমৃত সালসা তার প্রমাণও এর ভেতর নিহিত। সে-ই তাদেরকে সমগ্র জাতির উপর নেতৃত্বের আসন দান করেছিল। সমগ্র জাতির উপর সম্মানিত করে তুলেছিল। তাদের ইতিহাস থেকে এ কথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের জীবন, উন্নতি ও সাফল্য সবকিছু একমাত্র শরীয়তের উপরই নির্ভরশীল এবং একে নিজেদের কর্মপদ্ধতিরূপে গ্রহণ করার মধ্যেই তাদের স্থিতিশীলতা বিরাজমান। শরীয়তই হচ্ছে মুসলমানদের মূলভিত্তি।

বর্তমানে যদি মানব রচিত আইন সমাজের পথ প্রদর্শনীকে আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় তবে তা নতুন কোন কৃতিত্ব নয়। বরং এ ব্যাপারে সে শরীয়তেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই শরীয়ত

এই নীতির ঘোষণা দিয়েছে যে, সে সমাজের সংগঠন ও পুনর্বিন্যাস করবে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং সমাজের ব্যবহারিক জীবনকেও সুশৃঙ্খলরূপে সাজিয়ে তুলবে। সুতরাং আজ যদি আইনবিদগণ একটি নতুন নীতি গ্রহণ করে গর্ব করতে থাকে তবে তাকে আত্মপ্রসাদই বলতে হবে।

শরীয়তী আইনের আসল বৈশিষ্ট্য

যে সব ব্যাপারে শরীয়ত ও মানব রচিত আইনের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান, সেই পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোই হচ্ছে শরীয়তের বৈশিষ্ট্যময় বিশেষত্ব। এ দিক দিয়ে আমাদের বর্ণিত বৈসাদৃশ্যগুলোর আলোকে শরীয়ত মানব রচিত আইনের সাথে প্রতিযোগিতায় তিনটি মহান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

১. তার পূর্ণাঙ্গতা। অর্থাৎ একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের জন্য যে সব নিয়ম-কানূন, আদর্শ নীতিমালা ও দর্শনের প্রয়োজন হয় তা সব কিছুই এর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। এদিক দিয়ে সে অপর হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র। বর্তমানকে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যতেও সে সমাজের সমুদয় প্রয়োজনের পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম।

২. এর মহামহিমতা ও সর্বোচ্চতা। অর্থাৎ তার নীতি ও আদর্শ সমসাময়িক সামাজিক মানদণ্ড হতে উন্নত শ্রেণীর মানদণ্ডের ধারক-বাহক। তার মহামহিমতা ও উন্নতিও চিরন্তন ও স্থিতিশীল। এ এমন কিছু দর্শন ও নীতিমালার বাহক, যে সমাজ উন্নতি প্রগতির যতটি সোপানই অতিক্রম করুক না কেন, তার মান উন্নত হতে উন্নততর। শরীয়তী আইনের মহত্ত্ব আপন আসনে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত।

৩. এর চিরন্তনতা, অর্থাৎ কালের চক্র যতই ঘুরুক না কেন এবং অবস্থার যতই বিবর্তন হোক না কেন, শরীয়তের বিধান ও ঘোষণাবলীর মধ্যে সংস্কার ও বর্ধন-কর্তনের কোনই অবকাশ নেই, নেই কোন পরিবর্তনের সুযোগ। তার বিধান ও ঘোষণাবলী চিরন্তন ও স্থিতিশীলরূপেই প্রতিষ্ঠিত। সে তার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখেই সর্বযুগ ও অবস্থার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এজন্যই তাকে প্রগতিশীল ও গতিশীল ধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শরীয়তের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, একই মূলের সাথে এ সংশ্লিষ্ট এবং একই সত্যের বিভিন্ন প্রদর্শনী। আর তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ হওয়া এবং তিনিই এর রচয়িতা। এটা যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রণীত বিধান না হতো, তবে এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা, মহামহিমতা ও চিরন্তনতা পাওয়া যেতো না। কারণ, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র একজন মহান সৃষ্টিকর্তার দ্বারাই সৃষ্টি হতে পারে। কোন দুর্বল অপারগ সৃষ্ট জীবের হাতে এর সৃষ্টি কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

মানব রচিত আইনের বাতুলতা

ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপীয় আইন

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সমাজের উপর মানব রচিত আইনের একটি সীমারেখা পর্যন্ত যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর কারণ ছিল, এ আইনগুলোর মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক নীতিমালা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিশেষ সংমিশ্রণ ছিল। রোমানদের প্রাচীন যুগ হতেই আদেশ-নিষেধ, অভ্যাস-আখলাক, চরিত্র, ধর্মীয় বিধান ও বিচারালয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছিল এবং সেগুলো বংশ পরম্পরা জনসাধারণও মেনে চলতো। ফরাসী বিপ্লবের পর ইউরোপীয় আইন প্রণেতাগণ আইনের এ প্রাচীন ভিত্তিগুলোকে বিনষ্ট করতে লাগলো এবং জাগতিক স্বার্থ ও বাহ্যিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকেই আইনের ভিত্তিরূপে অধিক মর্যাদা দেওয়া হলো। ফল এই হলো যে, আইনের আধ্যাত্মিক ভাবধারার দিকটি অতিশয় দুর্বল ও অকেজো হয়ে পড়লো এবং জনসাধারণ ও জাতির অন্তঃকরণ আইনের হস্তক্ষেপ ও শাসনদণ্ড হতে মুক্ত হয়ে গেল। জনসাধারণের অন্তরের উপর প্রভাব-প্রতিপ্রত্তি বলতে কিছুই রইল না। ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রকে উপেক্ষা করার অনিবার্য পরিণতিরূপে উচ্ছৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও আইনের অবমাননা সাধারণ ব্যাধিরূপে দেখা দিল। সাথে সাথে বিপ্লব ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। মানুষের জীবন হতে সুখ-শান্তি-শৃঙ্খলা পর্যায়ক্রমে চলে যেতে লাগলো।

আইন অবমাননার আসল কারণ

আধুনিক আইনের অমর্যাদা ও অবমাননার একটি বড় কারণ হচ্ছে যে, ফরাসী বিপ্লবের সময় যে মুখরোচক দর্শন বলা হচ্ছিল,তার মধ্যে একটি দর্শন ছিল মানবিক সাম্য এবং দ্বিতীয়টি ছিল চিন্তার স্বাধীনতা। এ দু'টি দর্শনের পরস্পর মিলন ও সামঞ্জস্যের যে পদ্ধতি তৎকালীন আইনবিদগণ উপলব্ধি করেছিলেন তা ছিল আইন-আকীদা ও বিশ্বাসের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক অবশিষ্ট

থাকতে না দেওয়া। এরা আসলে এই ভুল চিন্তাধারার মধ্যে নিপতিত ছিল যে, চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি বহাল রেখে দেওয়া হয়, তবে তা স্বাধীন চিন্তাধারা ও আকীদা- বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণে বিভিন্ন বিশ্বাস ও চিন্তাধারার অধিকারী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারবে না।

এহেন ভ্রান্ত চিন্তাধারার তিক্ত পরিণতি এই হয়েছিল যে আধুনিক আইনকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এ জটিল সমস্যাটির সমাধান দ্বারা একদিকে যেমন মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো না, তেমনি এর মানবতা বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত না।

উল্লিখিত সমস্যার ইসলামী সমাধান

এ কথা আমরা সকলেই অবগত যে, ইসলামী আইনের ভিত্তি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ আইন তার মূল্য প্রকৃতির দিক দিয়েও ধর্মীয় আইন। ইসলামে সর্ববাদীসম্মত নীতি এই যে, তার আইন-কানূন যেমন মুসলমানদের উপর প্রয়োগ হবে তেমনি যে সব অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে নাগরিক অধিকার লাভ করেছে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অপরদিকে সাম্য ও চিন্তাধারার স্বাধীনতাও ইসলামের স্বীকৃত নীতিগুলোর মধ্যে শামিল রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বোঝা যায়, যে সব ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম জিম্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে, সেগুলোকে ইউরোপীয় আইন প্রণেতাগণ যেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তদ্রূপ কঠিন সমস্যার মুকাবিলা করতে হবে। আর ইসলামী আইনের পথেও সেই বাধার প্রাচীর এসে দন্ডায়মান হবে, যার সাথে টক্কর লেগে ইউরোপের ধর্মীয় ও নৈতিক আইনগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম এ জটিলতার অত্যন্ত সরল-সোজা ও উত্তম সমাধান পেশ করেছে। সে জগতের মুখরোচক দর্শনের পরিবর্তে বাস্তব ঘটনাবলীকে তার আসল রূপরেখায় অবলোকন করেছে এবং মানবতার সম্মুখে তার বাস্তব সমাধান পেশ করেছে। সে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতি অবলম্বন করে যে, যেসব ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিম সমান সেসব ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের উপর একই ধরন ও মানের আইন প্রয়োগ করা হবে। আর যে সব ব্যাপারে তারা পরস্পর ভিন্ন, সে সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য আইনও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

যে সব মানবিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিম জিম্মী সমান, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সকলকে একই দৃষ্টিতে অবলোকন করা উচিত। অবশ্য এদের আকীদা-বিশ্বাস পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কারণেই যে সব আইন আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, সে সব ব্যাপারে সমতার আদৌ কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই যখন ঐক্য ও সমতা পাওয়া যায় না, তখন এ গণ্ডীর মধ্যে আইনের সমতা বিধান করার কি অর্থ থাকতে পারে? বাস্তব কথা হচ্ছে যে, একদিকে যেমন সমমানের গ্রুপগুলোর মধ্যে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা সুবিচারেরই দাবি, তেমনি অপরদিকে অসম ও পরস্পর বিরোধী গ্রুপগুলোর মধ্যে সাম্য ও সমতার নামে একইভাবে তাদের চালান নিছক অবিচার ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং শরীয়ত এ ব্যাপারে যে নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে তা সাম্যের মৌলিক নীতিমালার কোন দিক দিয়ে পরিপন্থী নয়। বরং এটাই হচ্ছে সাম্যের আসল দাবি। কারণ সাম্যের মূল, প্রাণবস্তু ও মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যদি মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের বেলায় একইরূপ আইনগত ব্যবহার প্রদর্শন বৈধ করা হয়,তবে এর চেয়ে বড় জুলুম ও অবিচার কিছুই থাকতে পারে না। কেননা এর অর্থ হচ্ছে এদের উভয়কে নিজস্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আইনের আনুগত্য করার জন্য বাধ্য করা এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস মাফিক চলার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা। এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা আল-কুরআনের ঘোষণা : لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই—এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ ঘোষণার আওতায় মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে যেরূপ আইনগত ব্যবধান ও পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার একটি উদাহরণ হচ্ছে মদ্যপান ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা। ইসলামে এ দু'টি কাজ সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি আইনগত অপরাধ। কিন্তু একজন অমুসলিম যার ধর্মে এ কাজ নিষিদ্ধ নয় তাকে শরীয়ত এ আইনের আনুগত্য থেকে রেহাই দিয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যদি এ লোকের উপর এ আইন প্রয়োগ করা হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণ জুলুম ও বে-ইনসাফী। এমনিভাবে যদি মুসলমানদের মদ্যপান ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তা হবে তাদের ধর্মীয়

আকীদা-বিশ্বাসের অবমাননা। আমাদের এ উদাহরণ দ্বারা বোঝা গেল যে, যে সব ব্যাপার আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সব ব্যাপারে অন্ধভাবে একইরূপ আইন রচনা করে দেওয়া সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ এবং ধর্ম ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনিভাবে ধর্ম থেকে যদি আইনের সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণ কর্তন করে ফেলা হয় তবে এ কাজটিও সমগ্র আইন ব্যবস্থাপনাকে অন্তসারশূন্য ও প্রাণহীন করে দেওয়ার নামান্তর। কেননা এর পর আইনের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শাসন ক্ষমতা বলতে কিছুই বর্তমান থাকে না। সব কিছুই সে হারিয়ে ফেলে।

নিকৃষ্ট আইন

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, শরীয়তী আইনের তুলনায় মানব রচিত আইন সব দিক দিয়েই অপূর্ণ। কিন্তু এ মানব রচিত আইনের মধ্যে সেগুলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ, যেগুলো রচনা করার সময় যে জাতির জন্য এবং যে জাতির নামে রচনা করা হয় সে জাতির স্বার্থ, বৈশিষ্ট্য ও চিরাচরিত সামাজিক আচার- অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এ ধরনের আইনগুলোর অবস্থা এই যে, এগুলো জাতীয় চিন্তাধারা, দর্শন, চরিত্র, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ধরনের আইনের পিছনে যদিও জোরালো শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জনগণ থেকে আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়, তথাপি এ আইনগুলো কখনো সমাজের উপর বিজয় ও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে না। পারবে কিভাবে ? এ তো জনগণের আকীদা- বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষ বাঁধায়, তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের মন-প্রাণকে কঠিন মর্ম জ্বালার মধ্যে নিপতিত করে। এ ধরনের আইনের অনুকূলে আনুগত্যের দাবি উত্থাপন করা এবং তার আশা পোষণ করা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়; বরং এ ধরনের আইন সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এর বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ শত্রুতার আগুন ধূমায়িত হওয়া এবং এর সাহায্যকারী ও পৃষ্টপোষকদেরকে পদদলিত করে মেরে ফেলাটাই আশা করা যেতে পারে। এ ধরনের আইনের বিরোধিতাকে কখনো শক্তি বলে বাধ্য করে দাবিয়ে রাখা যায় না। জাগতিক শক্তি দ্বারা শুধু সেই ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতাকেই অবদমিত করা যায়—যা শুধু জাগতিক উপকরণ ও জাগতিক স্বার্থের তাগিদে

সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু যে বিরোধিতা ও শত্রুতা আকীদা-বিশ্বাস ও মৈলিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে আকীদা-বিশ্বাসের তাগিদেই প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে শত সহস্র-জুলুম- অত্যাচার ও শাস্তি দ্বারা বিরোধিতার অবসান করা যায় না। বরং ক্রমান্বয়ে শত্রুতার অনল দিগুণ বেগে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন

আইনের যে নিকৃষ্ট প্রকরণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা মিসরসহ অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে কম-বেশি প্রচলিত দেখা যায়। আমরা এর পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এ সব আইনের দ্বারা আইনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে না; বরং জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতিও হচ্ছে। আমাদের নীতি, আদর্শ ও স্বার্থের সাথে এর ক্ষীণতম সম্পর্কও পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং এগুলোকে কিছুতেই আমাদের জাতীয় আইন বলে অভিহিত করা কোন দিক দিয়েই সঠিক নয়।

আমাদের অন্তরে এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যেমন কোন অনুভূতি নেই তেমনি আমরা এর সম্মুখে আনুগত্যের মাথা অবনত করতেও আগ্রহী নই। ইসলামী রাষ্ট্রগুলো যেদিন থেকে ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছে সেদিন থেকেই সেখানে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ আইন প্রচলিত ছিল। এমন কি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদিগণ যখন এ দেশগুলোর শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়ে নিল, তখন হয় এরা সেখানে পাশ্চাত্যের আইন-কানূন চালু করে দিল অথবা স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের প্রভুদের ছত্রছায়ায় আধুনিক পদ্ধতির আইন নিজেদের দেশে চালু করার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলো। এ কাজের জন্য বারবার যে প্রমাণ পেশ করা হয়, তা হলো এই যে, এ আইনগুলো মুসলিম দেশসমূহে চালু করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সমাজকে গ্রহণ করা। এর দ্বারা এ কথাই বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তমদ্দুন উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করেছে। মুসলমানদের পিছনে পড়ে থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে শরীয়তী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও আনুগত্য।

বাতিল প্রমাণ

এ যুক্তির প্রবক্তাগণ যদি চিন্তা-ভাবনা করতো তবে তারা উপলব্ধি করতে পারতো যে,তাদের এ যুক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন। তারা বুঝতে পরতো যে, যে আইনের নামে তারা প্রাণপাত করছে তা সম্পূর্ণই ল্যাটিন আইন থেকে গৃহীত। রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যখন মুসলমানদের সংঘর্ষ বেধেছিল, সে সময় এ আইন রোমীয়দের কোন কাজেই আসেনি। মুসলমানরা তখন এই বিরাট সাম্রাজ্যের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহবিবাদ বাধিয়ে তাদের শায়েস্তা করেছিল। এমনিভাবে ক্রুসেডে সমগ্র ইউরোপ মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। অথচ এ সময় সমগ্র এশিয়া মহাদেশে রোমান আইনই কার্যকরী ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথা অবহিত হওয়া যায় যে, আরবে মুসলিম জাতির অভ্যুদয় অতি স্বল্পসংখ্যক লোকের সমন্বয় একটি ক্ষুদ্র জামা'আতরূপেই হয়েছিল। কখন তাদের অস্তিত্ব এ দুনিয়া হতে মিটিয়ে দেওয়া হয় এই চিন্তা ও ভয়ে সর্বদা তাদের সজাগ ও সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের বিশ বছর পর যে রাষ্ট্রটি শরীয়তী আইনকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে পারস্য সাম্রাজ্যটিকে দুনিয়ার পাতা হতে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে নিশ্চিহ্ন করেছিল। রোমান রাজতন্ত্রের কবল হতে সিরিয়া,মিসর ও উত্তর আফ্রিকাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। এরপর এক হাজার বছরের অধিক সময় ধরে মুসলমানরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনটি অলংকৃত করে রেখেছিল। তারা ইউরোপীয়দের পরাজিত করলো, তাতারীদের পরাভূত করলো, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের নিশান উড়ালো। সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামী আইনের ভিত্তিতেই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে এসেছিল।

মুহম্মদ আলী পাশার শাসনামলে মিসর ইউরোপের বহু দেশের তুলনায়ই অধিক শক্তিশালী ছিল। তারা এ সময় ফরাসীদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে মিসর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সমুদ্রপথে গিয়ে স্পেনের সাথে যুদ্ধ করেছিল। মিসরীয় সৈন্যবাহিনী গ্রীকদের ঘরে ঢুকে তাদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল। অথচ ইউরোপের বহু রাষ্ট্রই গ্রীকদের পিছনে সাহায্য যুগিয়েছিল। এ সময় যদি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ষড়যন্ত্র করে আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হতো তবে হিজাজ,সুদান, সিরিয়া, তুরস্ক ও মিসর আজও একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকতো। এ সব

যুগে আমাদের দেশে ইউরোপীয় আইন নয় বরং শরীয়তী আইনই প্রচলিত ছিল। মিসরের এ ইতিহাসই আমাদের ভ্রান্তি দূর করতে পারে।

এ সব বাস্তব ঘটনার সামনেও যদি কোন লোক বলে যে, মুসলমানদের অবনতির একমাত্র কারণ হচ্ছে শরীয়তী আইন এবং ইউরোপীয়দের উন্নতির কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্যের আইন, তবে এ ব্যক্তিকে এ কথা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে যে, কোন কোন সময় অমনোযোগীতা ও স্বার্থবাদিতা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে ছাড়ে। এমনিভাবে অজ্ঞান লোকদের মুসলমান ও পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা করা উচিত এবং ব্যর্থতা ও সাফল্যের মূল কারণ কি তাও উপলব্ধি করা উচিত। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا - فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ -

এরা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না ? সুতরাং এরা মানুষকে দেখছে যে তাদের মন আছে তা দিয়ে তারা সব কিছু উপলব্ধি করে। অথবা তাদের কান আছে তদ্দ্বারা তারা সবকিছু শুনে থাকে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে চোখ কখনো অন্ধ হয় না বরং বুকের মাঝের মন ও অন্তঃকরণই অন্ধ হয়।

—সূরা হজ্জ ঃ ৪৬

মুসলমানদের অবনতি শরীয়ত অনুসরণে নয়—শরীয়ত ত্যাগে

মুসলমানদের অবনতি শরীয়তের দ্বারা কখনো হয়নি বরং শরীয়তকে পরিত্যাগ করার ফলেই তাদের জীবনে অবনতির কালো ছায়া নেমে এসেছে। শরীয়তী আইন যে ভূপৃষ্ঠের সকল আইন-কানূন থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আইনের কোন সর্বোত্তম দর্শন আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি, যা শরীয়তের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও সব সুন্দররূপে বর্তমান নেই। আইনের পণ্ডিতেরা আইনের এমন কোন অত্যাধুনিক পথের ধ্যান-ধারণা পেশ করেন নি, যা শরীয়তের মধ্যে বিশদ বিবরণসহ বর্তমান নেই। মুসলমানরা শরীয়ত মাফিক

জীবন-যাপন করার কারণেই আজ এ জগতে অপমান ও গ্লানি ভোগ করছে না। বরং তাদের গ্লানি ও অবমাননার মূল কারণ হচ্ছে শরীয়ত মাফিক জীবন যাপন না করা। কারণ বর্তমানে সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানরাই শুধু মৌখিক দাবির ভিত্তিতে মুসলমান। তারা নিজেদের চিন্তাধারা, আকিদা-বিশ্বাস, আমল ও চারিত্রিক দিক দিয়ে মুসলমান নয়। তবে সকলেই যে এরূপ, তা নয়। কিছুসংখ্যক খাঁটি মুসলমান থাকলেও তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

আইনের মধ্যে যদি নতুনত্বই জাতীয় উন্নতি লাভের কারণ হতো তবে বেলজিয়াম স্পেনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও উন্নতি লাভ করতে পারতো, কারণ বেলজিয়ামের আইন হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন। আর স্পেনের বহু আইন হচ্ছে অতি প্রচীন। এর মধ্যে ইতিহাসের পাতায় তখন কোন স্পেনের নাম-গন্ধও ছিল না, তখনকার দিনের পুরানো আইনও এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং যারা শরীয়তের আইনকে প্রাচীন বলে মনে করে, তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। ইউরোপীয় আইনের তুলনায় শরীয়তের আইন পুরানো নয়। কারণ ইউরোপীয় আইন 'রোমান ল'-এর উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। রোমান আইনের নীতিমালার চৌহদ্দীর মধ্যেই হয়েছে এর ক্রমবিকাশ। রোমান আইনবিদগণ যে সব মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও দর্শন পেশ করেছিলেন, সেগুলোকেই এর মধ্যে মৌলিক ভিত্তিরূপে কার্যকর দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয় আইনের নব রচনা ও সম্পাদনার সমুদয় কাজই এ সব নীতিমালার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। হ্যাঁ, কোন কোন সময় তাকে অতি কঠিন প্রয়োজনের তাগিদে এ পথ থেকে দূরে সরে যেতে দেখা যাচ্ছে। এ দিক দিয়ে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মূল ভিত্তির দিক দিয়ে শরীয়তী আইন মানব রচিত আইনের তুলনায় পুরানো নয় বরং নতুন। কারণ, ইসলামী আইনের মূল হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্। কুরআন-সুন্নাহ রোমান আইন প্রণীত হবার পরই অবতীর্ণ হয়েছে।

এটা স্মরণীয় যে,শরীয়তের বদৌলতেই তারা এ জগতে জাতি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাদেরকে খায়রুল উম্মাহ (উত্তম জাতি) খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। শরীয়তই তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাদেরকে আদব- আখলাক, শিষ্টাচার-সভ্যতা ও ভদ্রতার সাথে পরিচিত করেছে। শরীয়তই তাদের মধ্যে শক্তি, ক্ষমতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছে, তাদের মধ্যে এমন বিশ্ব বিজয়ী মহামানব

সৃষ্টি করেছে যাঁরা ভূপৃষ্টে বিরাট বিরাট রাষ্ট্রের পত্তন করেছিল এবং এমন সব পন্ডিত ও সাহিত্যিক লোক জন্ম দিয়েছে যাঁরা জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নযীরবিহীন খেদমত রাখতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শরীয়তের আইনই হচ্ছে সর্বপ্রথম আইন যা মানুষের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাম্য ও সাধারণ সুবিচারের ধ্যান-ধারণাটিকে বাস্তবে রূপদান করেছে এবং তাদের উপর সৎ ও আল্লাহভীরুতার কাজে সহযোগী হওয়া এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করাকে ঈমানী কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য লাভের দিক দিয়ে মানব রচিত আইন শরীয়তী আইনের পাশেও দাঁড়াতে পারে না। মুসলমানদের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, তারা যতদিন শরীয়তের আঁচল আঁকড়িয়ে রয়েছিল ততদিন এ জগতে তারা উন্নতি ও সাফল্যের দ্বারোদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। আর যখন তারা এর আঁচল ছেড়ে দিল তখন তারা ইসলামের পূর্বকার অজ্ঞানতা ও জাহেলিয়াতের আঁধারের মধ্যে নিমজ্জিত হলো। অবমাননা ও দারিদ্র্যও তাদেরকে এসে ঘিরে ফেললো। তারা জালিমের দৌরাত্ম্যের মুকাবিলা করে নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলারও যোগ্য রইল না।

প্রথম যুগের মুসলমানরা যেমন ঈমান গ্রহণ করেছিল, তেমনি তারা ঈমানের হকও আদায় করেছে এবং ঈমানের দাবি পূরণ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাও এ ভূ-পৃষ্ঠে তাদেরকে শাসন ক্ষমতায় সমাসীন করেছেন। যেই মহা পরাক্রমশালী এ মুসলমানদেরকে স্বল্পতা সত্ত্বেও শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে শক্তি ও ক্ষমতা দান করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কাছে এটা করার জন্য ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্র চেয়ে বড় ওয়াদা পূরণকারী হতে পারে কে?

তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ –

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের দাবি মাফিক কাজ করে, তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে এ

ভূ-পৃষ্ঠে তাঁর শাসন ক্ষমতা দান করবেন,যেমন তিনি এদের পূর্বেকার লোকদের দান করেছিলেন। —সূরা নূর ঃ ৫৫

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ - يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নিকট হতে আলো ও প্রকাশ্য কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আনুগত্য করে, তাদের তিনি এর দ্বারা শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসেন ও সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করেন। —সূরা মায়িদা ঃ ১৫-১৬

মানব রচিত আইনের বাতুলতা

কুরআন, সুন্নাহ এবং তার মূলনীতি আদর্শ ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরিপন্থী প্রতিটি আইনই সাধারণভাবে বাতিল। কোন মুসলমানের পক্ষে এহেন আইনের আনুগত্য করা বৈধ নয়। বরং এর বিরোধিতা করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব ও রসূলকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, মানুষ এর পায়রবী করে চলবে। সুতরাং যে লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত মাফিক কাজ করবে তার কাজ সঠিক ও বৈধ। কেননা তা শরীয়তের মূল কর্তার নির্দেশ মাফিকই হয়েছে। আর যে লোক শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করে তার কাজ বাতিল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

আমি সকল নবী-রাসূলকেই আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক তাদের আনুগত্য করার জন্য প্রেরণ করেছি। —সূরা নিসা ঃ ৬৪

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা নিয়ে নাও। আর তোমাদেরকে যা কিছু করতে নিষেধ করেন তা থেকে ফিরে থাক! —সূরা আল-হাশর ঃ ৭

বাতিল হবার প্রমাণ

ইসলামে আইন প্রণয়নের উৎস হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা। ইসলামী শরীয়ত হতে মুক্ত হয়ে যে আইন প্রণয়ন করা হয়, সে আইন যে বাতিল ও ভিত্তিহীন, সে ব্যাপারে এ তিনটি উৎসমূলের মধ্যেই দলীল-প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণা সম্পূর্ণ অবিসংবাদিত। নিম্নে আমরা বেশরীয়তী আইন বাতিল হবার কতিপয় দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছি ঃ

১. আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্য ও পায়রবীর শুধুমাত্র দু'টি পথই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের হুকুমের আনুগত্য করতে হবে নতুবা নফস ও মানবিক বৃত্তির ইচ্ছার আনুগত্য করতে হবে। এ দু'টির মধ্যবর্তী আনুগত্যের বিকল্প অন্য কোন পথ নেই। এ দু'টির একটি হচ্ছে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ, আর অপরটি হচ্ছে নিছক পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর পথ। কালামে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ -

তারা যদি আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে আপনি জেনে রাখুন যে, তারা নফস ও মানবিক প্রবৃত্তিরই আনুগত্য করছে। আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত ও হুকুম ব্যতিরেকে যারা নফসের ইচ্ছার আনুগত্য করে, তাদের চেয়ে বড় গোমরাহ আর কে থাকতে পারে? —সূরা আল-কাসাস ঃ ৫০

يٰدَاوٗدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হে দাঊদ! আমি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে শাসক বানিয়েছি। সুতরাং মানুষের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করো। নফসের আনুগত্য করো না, তা হলে তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে দূরে সরিয়ে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে।

—সূরা সাদ ঃ ২৬

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

আর আমি আপনাকে শাসনকার্য পরিচালনার একটি নিয়ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এর অনুগত হোন। আপনি অজ্ঞান লোকদের নফসের ইচ্ছার আনুগত্য করবেন না।

—সূরা জাসিয়া ঃ ১৮

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ -

যা কিছু আপনার কাছে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার আনুগত্য করুন, এ ছাড়া অন্যান্য সহযোগী ও বন্ধু-বান্ধবের আনুগত্য করবেন না। খুব কম লোকই নসীহত গ্রহণ করে থাকে।

—সূরা আ'রাফ ঃ ৩

আল-কুরআনের উল্লিখিত ঘোষণা শরীয়তের পরিপন্থী ও বিরুদ্ধবাদী নির্দেশ ও কাজের আনুগত্যকে সম্পূর্ণ হারাম নির্ধারণ করেছে এবং শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন কিছু মাফিক কাজ করাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। যে লোক এমন করে থাকে, তার উপর নফসের পায়রবীর হুকুম প্রযোজ্য হয়েছে। এমন লোক পথভ্রষ্ট, জালিম এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানের বিদ্রোহী। সে আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছুকে প্রভু বা উপদেষ্টা বানিয়ে নিয়েছে বলে বুঝাবে।

২. আল্লাহ তা'আলা গায়রুল্লাহ্ থেকে প্রশাসনিক বিধান—এক কথায় জীবন বিধান ও আইন-কানূন গ্রহণকে হারাম করেছেন। কোন মু'মিন লোকের জন্য আল্লাহ্‌র আইন-কানূন ও বিধান ব্যতীত অপর কারোর আইন-কানূন ও বিধানের উপর খুশি ও নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমেই বৈধ নয়। এটাকে শয়তানের আনুগত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوٓا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوٓا اَنْ يَّكْفُرُوا بِهٖ – وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا –

আপনার এবং আপনার পূর্বকার নবী-রাসূলদের উপর অবধারিত বিষয়াবলীর উপর ঈমান গ্রহণের দাবি যারা করে থাকে, তাদের পানে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? তারা নিজেদের সমস্যা ও মামলা-মুকদ্দমা তাগূতী শক্তির কাছ (গায়রুল্লাহ্‌র কাছে) থেকে মীমাংসা ও নিষ্পত্তি করিয়ে নিতে চায়। অথচ তাগূতী শক্তি ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে। শয়তান এদেরকে পথভ্রষ্ট করে দূর-দূরান্তে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক।
—সূরা নিসা ঃ ৬০

সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র অবতারিত এবং তাঁর রাসূলের আনীত শিক্ষা মাফিক নিজেদের সমুদয় সমস্যা ও মামলা-মুকদ্দমার নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করে না, তারা নিঃসন্দেহে তাগূতী শক্তি ও ক্ষমতাকেই শাসক ও বিচারক বানিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র দাসত্বের পরিবর্তে প্রভুত্ব ও আনুগত্য পাবার পদমর্যাদা গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে তাগূত, তারাই আল্লাহ্‌দ্রোহী ক্ষমতার আসনে সমাসীন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূল ব্যতীত যাকেই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মুকদ্দমার সালিস মনোনীত করা হয়, তার ইবাদত করা হোক বা শর্তহীন আনুগত্য করা হোক, সবই তাগূতের পদমর্যাদা ও সংজ্ঞায় পড়ে। যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার থেকে সমাধান ও ফয়সালা গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছে তাদের জন্য গায়রুল্লাহ্‌র আইন-কানূন, শাসন ও বিচার-ফয়সালা মেনে নেওয়া বৈধ নয়।

৩. আল্লাহ্ তা'আলা কোন মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য এ বৈধতার কোন অবকাশ রাখেনি যে, তারা এমন কোন ব্যাপারে নিজেদের নির্বাচনী স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে পারবে যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূল কোন ফরমান জারি করেছেন। যারা এমনি করে, আল কুরআন তাদেরকে কাফির, জালিম ও ফাসিক নাম দিয়েছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার রসূল যখন কোন মীমাংসা করেন তখন আর কোন মু'মিন নর-নরীর জন্য সে ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকে না। —সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬

৪. আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিধান মাফিক প্রত্যেকটি ব্যাপার মীমাংসা করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ -

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মাফিক ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।
—সূরা মায়িদা ঃ ৪৮

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ -

আমি আপনার কাছে হক-এর সাথে অর্থাৎ যথার্থ পন্থায় কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি মানুষের মধ্যে সেই বিধান মাফিক মীমাংসা করতে পারেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে বুঝিয়েছেন। —সূরা মায়িদা ঃ ১০৫

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ... هُمُ الظّٰلِمُوْنَ... هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মুতাবিক বিচার-ফয়সালা করে না, তারা কাফির;... তারা জালিম.... তারা ফাসিক। —সূরা মায়িদা ঃ ৪৫-৪৭

এটা সর্ববাদীসম্মত মত যে, যদি কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধানমতে নিজেদের সমস্যার সমাধান বা মামলা- মুকদ্দমার বিচার-ফায়সালা করে, তবে তার উপর আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত তিনটি

ঘোষণার কোন-না-কোন একটি ঘোষণা অবশ্যই প্রযোজ্য হয়। যেমন চুরির অপরাধ, মিথ্যা অপবাদ চাপানোর অপরাধ অথবা ব্যভিচারের ব্যাপারে কোন লোক যদি অনৈসলামী আইন অনুযায়ী নিজেদের মামলা-মুকদ্দমার জন্য বিচার করাতে চায় যে, সে অনৈসলামিক আইনকে ইসলামী আইনের তুলনায় উত্তম ও ভাল মনে করে, তবে নিঃসন্দেহে সে লোক কাফির। যদি কোন লোক মনে-প্রাণে বা মৌখিকভাবে ইসলামী আইনের শাসনকে উত্তম মনে করে কিন্তু ঈমানের দুর্বলতা অথবা অন্য কোন বাধ্যবাধকতার দরুন অনৈসলামিক আইনের সাহায্য নেয়, তখনও সে ফাসিকদের দলে শামিল হবে। আর যদি কারো হক নষ্ট করা হয় বা কারো সাথে বেইনসাফী করে তখন সে জালিমের খাতায় তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তার শপথ করে বলেছেন যে, কোন লোক তখন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যখন পর্যন্ত সে ছোট-বড় সকল ব্যাপারে রাসূলকে সালিস ও মিমাংসাকারীরূপে স্বীকার করে না নেবে। ঈমানের জন্য এ ধরনের শাসক বা মিমাংসাকারী মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয় বরং ঈমানের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে খোলা মনে উদার চিত্তে এবং ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا –

না—আপনার প্রভুর শপথ! তখন পর্যন্ত এসব লোক ঈমানদার হতে পারবে না, যখন পর্যন্ত আপনাকে নিজেদের বিবদমান ব্যাপারে সালিস ও বিচারক মনোনীত না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসা শুনে অন্তরে কোনরূপ সন্দেহও অনুভব করবে না। বরং ঐকান্তিকভাবেই মাথা পেতে তা স্বীকার করে নেবে। —সুরা নিসা ঃ ৬৫

৬. ইসলামী বিধান মতে যা কিছু হারাম, তা মানব রচিত আইন-কানূন দ্বারা হালাল হওয়া সত্ত্বেও হারামই থেকে যায়। ইসলামে আইন প্রণয়নের অধিকার ও

ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এ অধিকার ও ক্ষমতাকে একজন মুসলমান ইসলামের আরোপিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে ব্যবহার করতে পারে। কোন শাসক যদি এ সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায় এবং এমন সব আইন-কানূন রচনা ও প্রয়োগ করতে লেগে যায়, ইসলামে যার কোন অবকাশ নেই, তবে মুসলমানের জন্য শরীয়ত মাফিক এ আইনের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। বরং তাদের কর্তব্য হচ্ছে, এ আইনকে পরিবর্তন করার আন্দোলন ও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে শরীয়তী আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করা । কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -

হে ইমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের উলিল আমর বা শাসকগণের। যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে (তাদের ফয়সালার কাছে) ফিরে যাও—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান ও আস্থা পোষণকারী হও। পরিণতির দিক দিয়ে এটাই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। —সূরা নিসা ঃ ৫৯

আল্লাহ তা'আলা তার নিজের আনুগত্য করতে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। 'আনুগত্য' শব্দটি বার বার উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূলের আনুগত্যেরও একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। রাসূল যে কাজটির হুকুম করেন, তা কুরআনে থাকুক বা না থাকুক, তার আনুগত্য করে যেতে হবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اوتيت الكتاب ومثله معه -

আমাকে কিতাব এবং অনুরূপ তার সাথে আর এক বস্তু দান করা হয়েছে।

কিন্তু 'উলিল আমর' শব্দের সাথে ইতায়াত ও আনুগত্যের মর্ম সম্বলিত শব্দ উল্লেখ করা হয়নি। কেননা এ আনুগত্যের ধরনটি স্বতন্ত্র নয় বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে উলিল আমরদের আনুগত্যের কথা। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলের আনুগত্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার রাসূলের আনুগত্যের হক আদায় করা হলো, তাদের বিরোধিতা করার কোনই আশংকা যখন রইলো না, তখনই উলিল আমরদের আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং যে সকল শাসক আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের ফরমান মাফিক হুকুম দেন তখন তাঁর হুকুম পালন করা ওয়াজিব হয়। আর যাঁরা তাদের ফরমান ও হুকুমের বিপরীত হুকুম দেন তখন তাঁদের হুকুমের আনুগত্যের অধিকার থাকে না।

বে-শরীয়াতী আইন বাতিল হবার প্রমাণ

৭. আল-কুরআনের পর সুন্নাহ্ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে উলিল আমরের আনুগত্যের সীমারেখাটি অংকন করে দিয়েছে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমীর-উমারা ও শাসকদের আনুগত্য করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বিষয়টি ফুটে ওঠে ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق انما الاطاعة فى المعروف -

স্রষ্টার নাফরমানির কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করতে নেই। ন্যায় ও সৎকাজে আনুগত্য করতে হবে।

من امركم منهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة -

ঐ সব আমীর-উমারা ও শাসকদের মধ্যে যাঁরা তোমাদেরকে পাপ কাজের হুকুম করবে তাদের কথা তোমরা শুনবে না, মানবে না।

السمع والطاعة على المرء فيما ما احب وكره ان يومر بمعصية فلا سمع ولا طاعة -

পসন্দ হোক বা না হোক, আনুগত্য করা ওয়াজিব। তবে আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজের যদি নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তা মানা ও শোনা যাবে না।

انه سبيلى امركم من بعدى رجال يطيفون السنة ويحدثون البدعة ويوخرون الصلوة عن مواقيتها قال ابن مسعود يارسول الله كيف بى اذا ادر كتهم قال ليس يا ام عبد لاطاعة لمن عصى الله قالها ثلاث مرات –

আমার পরে এমন সব লোক শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ শাসন করতে থাকবে, যারা সুন্নাত মিটিয়ে ফেলবে এবং বিদ'আত জারি করবে। নামায ওয়াক্ত ছাড়া পিছিয়ে পড়বে। ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমি যদি এমন শাসকদেরকে পাই তবে কি করব ?" আল্লাহ্র রাসূল তখন জবাব দিলেন, "হে উম্মে আবদ! যারা আল্লাহ্র নাফরমানি করবে তাদের আনুগত্য করা জায়েয নেই।" হুযূর (স) এমনি তিনবার বললেন।

৮. হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর সমগ্র মুসলিম জাতি এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে বিষয়টিকে ইজমার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, আল্লাহ্র বিধানের অধীনেই শাসনকার্যে আনুগত্য করা বৈধ। আর ইসলামী চিন্তাবিদ (মুজতাহিদ) ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যেও মূল শাসক ও হুকুমদাতা যে একমাত্র আল্লাহ্রই সত্তা সে বিষয়েও মৌখিক ও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তারা এ ব্যাপারেও সম্পূর্ণ একমত যে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যে সব বস্তু হারাম প্রতিপন্ন হয়েছে, সেগুলোকে হালাল ও বৈধ মনে করাও কুফরী। সুতরাং যদি কোন লোক ব্যভিচারী ও মদ্যপানকে হালাল মনে করে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকে আদেশ-নিষেধের সর্বময় কর্তা ভাবে, তবে এটাও কুফরীর মধ্যে শামিল হবে। এমনিভাবে যে সব শাসক প্রকাশ্যে কুফরীর গুনাহে

লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব আর এ বিদ্রোহের সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে শাসকের সেই সব আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে চলা, যেগুলো ইসলামের পরিপন্থী।

৯. ইসলামের মৌলিক নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য আইন প্রণয়নের সীমাহীন ও নিঃশর্ত কোন অধিকার নেই। তাদেরকে দু'দিক দিয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তারা গঠনমূলক আইন প্রণয়ন করবে অর্থাৎ শরীয়তের বিধান ও ঘোষণাবলী বাস্তবায়িত করার জন্য নিয়ম-কানূন ও তার বাস্তব কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। দ্বিতীয়ত, তারা রাষ্ট্রের সাংগঠনিক আইন প্রণয়ন করবে অর্থাৎ তারা এমন আইন প্রণয়ন করবে, যা ইসলামী সমাজের শাসন শৃংখলা এবং তার সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অপরিহার্য। যে সব ক্ষেত্রে শরীয়ত নীরব ভূমিকা অবলম্বন করেছে সে সব ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় ধরনের আইন বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের আইন সম্পর্কে এই সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, এ ধরনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনরূপ শর্ত-সীমা থাকবে না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এ ধরনের আইন প্রণয়নের বেলায়ও আমাদের অবাধ ও পূর্ণাঙ্গ অধিকার দেওয়া হয়নি। বরং এ ধরনের আইন প্রণয়নের সময়ও শরীয়তের সাধারণ নীতিমালার প্রতি দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য। এর আলোকেই সাংগঠনিক আইন প্রয়োগের কাজটি বাস্তবায়িত হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে উভয়প্রকার আইন প্রণয়নই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে সীমায়িত। আমাদের শাসকবৃন্দ ও আইন প্রণেতাগণ একদিকে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত খলীফা। অপরদিকে তারা ইসলামী সমাজের প্রতিনিধি। রাসূলের খলিফা হওয়ার দিক দিয়ে তাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরোধিতা আদৌ বৈধ নয়। এমনিভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধি হবার দিক দিয়ে তাদের জন্য এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, তারা মুসলমানদের সামাজিক কর্মপন্থা ও দর্শনের বিরোধিতা করে চলবে। তাদেরকে রসূলের স্থলাভিষিক্ত এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের মসনদ এজন্য সোপর্দ করা হয়েছে যে, তারা দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে, দীনকে খতম করার জন্য কিছুই করবে না।

১০. মুসলমানদের শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে শরীয়ত। এ কারণেই যে আইন শরীয়ত মাফিক হবে তা-ই বৈধ। আর যা তার পরিপন্থী হবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। শরীয়তকে যখন পর্যন্ত বাতিল করা না হবে তখন পর্যন্ত তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহ্‌র একটি কিতাব তাঁর অন্য কিতাব দ্বারাই বাতিল ঘোষিত হতে পারে। আর এক রাসূলের সুন্নত অপর রাসূলের সুন্নত দ্বারাই বাতিল হতে পারে। কিতাব ও রাসূল আগমনের পরম্পরা ধারাটি এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। এ কারণেই শরীয়তী আইনের মধ্যে রদ-বদল ও পরিবর্তন করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর মানব রচিত আইনও শরীয়তী আইনের স্থানে আসন গ্রহণ করতে পারে না।

মিসরে মানব রচিত আইনের কুফল

মিসরীয় আইনের বাতুলতা

সাধারণ মানব রচিত আইনের অবৈধতার কারণগুলো ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মিসরীয় আইন বাতিল হবার আরো বহু কারণ বর্তমান রয়েছে। এ আইনগুলো বাতিল হবার একটি কারণ হচ্ছে—এ আইনগুলোর অধিকাংশই মিসরীয় শাসনতন্ত্রের বিরোধী। মিসরীয় শাসনতন্ত্রে সর্বপ্রথমই এ ধারাটি সন্নিবেশিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রের গতানুগতিক ধর্ম এবং সরকারী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের আইনগত ব্যবস্থাপনার শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি ইসলাম। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র উৎসমূল, যা থেকে সমুদয় আইন বের হবে এবং এর থেকেই আইন প্রণয়নের সময় পথের দিশা নিতে হবে। আসলে এ শাসনতান্ত্রিক ধারাটি আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের উপর শর্ত আরোপ করে। ইসলামী শরীয়তের আরোপিত শর্তসীমার বহির্ভূত এবং তার আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়নের সুযোগ আমাদের নেই। কেননা শাসনতন্ত্র মাফিক সমুদয় অনৈসলামী আইনকে বাতিল মনে করা একজন মিসরীয় ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ তা শাসণতন্ত্রের বিরোধী। সংস্থাপনী বিধি ও নিয়ম-কানূন (Administrative Law) সর্বদা শাসনতান্ত্রিক আইনের (Constitutional Law) অনুবর্তী হয়। এ দু'টির মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধিতার সময় প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির আলোকে বাতিল ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়। মিসরীয় আদালত এ ধরনের আইনগুলোকে সর্বদা বাতিল ঘোষণা করেই এসেছে। সুতরাং মিসরের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৫ সনের এক নম্বর রায় ঘোষণা করতে গিয়ে লিখেছে যে, শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তিস্তম্ভের মধ্যে কোন ভিত্তিস্তম্ভকে কোন আইনের ক্ষেত্রে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেওয়া হলে সে আইন শাসনতন্ত্রের বিরোধী (Ultravires of constitution)-এ পরিগণিত হবে। এ রায়ের আলোকে রাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্তৃক রচিত একটি আইনকে বাতিলও ঘোষণা করা হয়েছিল। শাসনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও আইনের দৃঢ় শাসনের জন্য সর্বোত্তম নিশ্চয়তা হচ্ছে আইন প্রণয়নের

ক্ষেত্রে সর্বদা শাসনতান্ত্রিক সীমারেখার মর্যাদা রক্ষা করা। আইনের সঠিক ব্যাখ্যা দান ও সমালোচনা করা এবং আইনের মধ্যে বৈপরীত্য ও সংঘর্ষজনিত অবস্থায় কোন্‌টি শাসনতন্ত্রের অনুগামী এবং কোনটি শাসনতন্ত্রের বিরোধী তার মীমাংসা করার অধিকারও আদালতের রয়েছে। শুধু এতটুকুই নয় বরং আদালতগুলোর অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে-কোন আইন শাসনতন্ত্রের সাথে সংঘর্ষশীল হলে তাকে সে বাতিল ঘোষণা করবে এবং এ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের মীমাংসাকেই সমর্থন দেবে। কেননা শাসনতন্ত্রই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন এবং সাধারণ আইনের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান।

সাধারণ আইন সম্পর্কে একটি সর্ববাদীসম্মত নীতি হচ্ছে, কোন আইন আইনের সর্বজনপরিচিত ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী হয়ে পড়লে তার ব্যাখ্যা এমনভাবে করা উচিত, যা আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিরোধী না হয়। সুতরাং মুসলিম জাতি সম্পর্কে যখন চূড়ান্তরূপে মীমাংসিত যে, তা ইসলামের গণ্ডীর বাইরে পা রাখতে পারবে না, তখন বিদেশী আইনগুলোকে মুসলিম দেশসমূহে প্রয়োগ করার পূর্বে ইসলামের ছাঁচে ঢালাই করে সাজিয়ে নেওয়া এবং এর অনৈসলামী অংশকে পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের দেশে যে সব পাশ্চাত্য আইন চালু করা হয়েছে সেগুলো আইনের মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে কিরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং কিরূপে আইনের চিরপরিচিত নীতিমালাগুলোর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ তা আমরা ইতঃপূর্বে অবহিত হয়েছি। সুতরাং এদিক দিয়ে লক্ষ্য করলেও পাশ্চাত্যের আইনের অনৈসলামী দিকগুলো প্রয়োগের সময় পরিহার করা এবং পরিবর্তন ও সংশোধনহীন অবস্থায় গ্রহণ না করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য আইনের প্রভাব

পশ্চিমা আইনগুলো মূলত এমন সব দেশ ও সমাজের জন্য রচনা করা হয়েছে, যে দেশের পরিবেশ আমাদের দেশের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানকার অধিবাসীদের সাথে আমাদের মিল খুবই কম, বরং অমিলই বেশি। এ আইনগুলোর মধ্যে যেমন ভাল আছে তেমনি মন্দও আছে। এগুলোর কিছু কিছু অংশ আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মিল রাখে বটে, তবে অধিকাংশই বিরোধী। এগুলোর কিছু অংশ আমাদের মন গ্রহণ করে নিলেও অধিকাংশের দ্বারা

আমাদের মনে ঘৃণার জন্ম দেয়। এ আইনগুলো আমাদের চিন্তাধারাকে যেরূপ কলুষিত ও বিপথগামী করেছে আমাদের মন- মানসিকতাকেও তদ্রূপ খারাপ করেছে। এ আইনগুলো দ্বারা যেমন আমাদের সমাজ বহুধা বিভক্ত হয়ে অনৈক্যের শিকারে পরিণত হয়েছে তেমনি আমাদের জীবনে তিক্ততা ও দুঃখ-দুর্দশাও ডেকে এনেছে। এগুলোর কারণেই আমরা একই সময় একটি বস্তুকে হারাম ও হালাল ভেবে থাকি। আমরা আকীদা-বিশ্বাস রাখি একরূপ, আর কাজ করি তার পরিপন্থী অন্যরূপ। এ বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য সর্ব ব্যাপারে ও সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান।

মিসরের মর্যাদা

উদাহরণসরূপ মিসরীয়দের কথাই ধরুন। এ দেশটি ইসলামের প্রতিটি সামাজিক শাখায় মুসলিম দেশগুলোকে পথ প্রদর্শন করে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, আমরা যখন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করবো তখন আমাদের পক্ষে জরুরী হচ্ছে জীবনের প্রতিটি বিভাগ-উপবিভাগের উপর দৃষ্টি রাখা। কারণ ইসলাম জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় প্রতিটি ব্যাপারেই আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে এবং পরকালে সাফল্যময় ও বরকতময় জীবন দান করে। আমাদের রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা অনুসরণ করে চললে তা অনুরূপ ইবাদতের মধ্যেই শামিল হবে,যেরূপ নামায, রোযা, হজ্জ,ও যাকাত। এদিক দিয়ে মিসর হচ্ছে ইসলামী জাহানের প্রাণকেন্দ্র। ইসলাম তার প্রথম যুগে এসেই এখানে চিরস্থায়ীভাবে ঘর বেঁধেছে। তেরশত বছর পূর্বে রাসূল (স)-এর সাহাবাদের দ্বারাই এদেশ ইসলামী হয়েছে। এ দেশের অধিবাসীরা ইসলামের দাওয়াতে এমনভাবে সাড়া দিয়েছিল যে, বর্তমানে এখানে শতকরা পাঁচজনের বেশি অমুসলমান নেই। এ মিসরেই বিশ্ব-বিখ্যাত জামে-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এটা হচ্ছে ইসলামী জগতের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একমাত্র ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমগ্র দুনিয়ার জ্ঞানপিপাসু লোকেরা এখানে এসে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং নিজ-দেশে গিয়ে স্বীয় জ্ঞান-দ্বারা দেশবাসীকে উপকৃত করে। বহুদিন থেকে এ দেশটিকে ইসলামের স্তম্ভ ভাবা হয়। এ দেশটিই ক্রুসেডারদের ও তাতারীদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছে এবং সর্বদা

ইয়াহূদীবাদ ও সামাজ্যবাদের মুকাবিলা করে চলেছে। একমাত্র এ দেশটিই আল্লাহ্ এবং তাঁর দীনের দুশমনদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। প্রত্যেক যুগেই এ দেশটি ইসলামের আশ্রয়স্থল, পুণ্যবানদের লক্ষ্যবস্তু এবং ইসলামের মজলুম মুজাহিদগণের আশ্রয়স্থলরূপেই ছিল ও আছে। ইসলামের প্রথম যুগে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আর বর্তমান যুগে এমন একটি ইসলামী আন্দোলন উঠেছে যা দীন প্রতিষ্ঠার একটি বিরাট শক্তিশালী আন্দোলন। এ আন্দোলন মিসর থেকে শুরু হয়ে সমগ্র ইসলামী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। যে আন্দোলন এ দেশগুলোর ইসলামী জনতাকে একই সূতোর মালায় গেঁথে ফেলেছে। সে মুসলমানদের এমন একটি বংশ সৃষ্টি করেছে, যাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী এক ও অভিন্ন এবং এরা একই লক্ষ্যবিন্দুর পানে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়ে চলছে। কুরআন হচ্ছে এদের শাসনতন্ত্র, মহানবী (স) হচ্ছেন এদের নেতা এবং আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ করা হচ্ছে এদের আন্তরিক কামনা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত ঘোষণাটির বিমূর্ত জীবন্ত প্রতীক হচ্ছে এরা ঃ

> আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে যে সকল মু'মিন বাস্তবে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে, এদের মধ্যে কিছু লোক নিজেকে উদাহরণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং কিছু লোক এ জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। এরা নিজদের অঙ্গীকারকে কোনরূপ পরিবর্তন করেনি। —সূরা আহযাব

মিসর প্রাচীনকালে ও বর্তমান যুগে ইসলামের যে খিদমত করে আসছে এবং সেখানে যে ইসলামী পরিবেশ বর্তমান রয়েছে, সে কারণেই এ দেশটি মুসলমানদের দীনী আশা-আকাঙক্ষার বেলাভূমিতে পরিণত হয়েছে! এ দেশটি সর্বদাই ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং তার প্রচারের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করে আসছে। বর্তমানেও এখানকার লোকেরা আল্লাহ্র দীনকে প্রচারের জন্য কর্মতৎপর।

চিত্রের অপরদিক

এখন আপনারা মিসরের অপরদিকে লক্ষ্য করুন। যে মিসর ইসলামের খিদমত ও প্রতিরক্ষার দাবিদার, সে মিসর ইউরোপীয় আইন-কানূন নিজ দেশে প্রচলিত করে ইসলামের সাথে কিরূপ দুর্ব্যবহার করেছে তাই দেখুন। এ আধুনিক

আইনগুলো এমন সব দেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে, যেগুলো নাস্তিকতা ও নির্লজ্জতার দোষে দুষ্ট। এগুলোকে হয় ফ্রান্স থেকে অথবা স্পেন থেকে ধার করা হয়েছে। রাত-দিন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেই তারা লিপ্ত। অথবা এগুলোকে সেই ইটালী থেকে আমদানী করা হয়েছে, যে ইটালীর ইতিহাস ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামের কাহিনীতে ভরপুর। এ আইনগুলো এমন অমুসলিম জাতির থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যারা খৃষ্টবাদের দাবিদার হলেও হযরত ঈসা (আ)-র শিক্ষা ও তালিমের ধার ধারে না। ঈসা (আ)-র উপর ঈমান আনার দাবি করলেও আসলে তারা কুফরী ও শিরকীর ভিত্তির উপর নিজেদের জীবনের সৌধ ইমারত গড়ে তুলছে। মিসর হচ্ছে মুসলমানদের দেশ। একজন মুসলিম শাসকই সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। রাষ্ট্রের সরকারী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং ইসলামের নিয়ম ও রীতি-নীতির পৃষ্টপোষকতা করা, মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলোর তত্ত্বাবধান করা এবং ইসলামী শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও তাহযীব-তমদ্দুনকে জীবিত রাখাই হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, আদব-আখলাক ও চরিত্রকে ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। এ কাজগুলো করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শামিল। কিন্তু এত সব ঘোষণা সত্ত্বেও মিসর সরকার আধুনিক আইনের সহায়তায় শরীয়তী আইনকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করে রেখে দিয়েছে।

মিসর সরকার দেশে শরীয়তী আইনের পরিবর্তে ফিরিঙ্গী আইন চালু রেখেছে। অথচ এ আইনগুলো ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে ইসলামী আইনের সাথে কোন দিক দিয়েই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। এমনিভাবে সরকার ইসলামী সভ্যতা ও তাহযীব-তমদ্দুনকে জীবিত রাখার পরিবর্তে তার কবর খননের কাজ অনবরত করে যাচ্ছে। মিসরীয় সরকার তাদের দীন প্রতিষ্ঠার এহেন পরিপন্থী পন্থা গ্রহণে আদৌ লজ্জাবোধ করছে না। অথচ কালামে মজীদে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অতঃপর আমি তোমাদেরকে দীনের ব্যাপারে একই পথ প্রদর্শন করেছি, সুতরাং সেই পথেরই অনুগামী হও। আর অজ্ঞান ও নির্বোধ লোকের খাহেশ ও ইচ্ছার আনুগত্য করো না। —সূরা আজ্‌জাসিয়া ঃ ১৮

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ -

তোমাদের কাছে যা কিছু তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিল করা হচ্ছে তোমরা তার আনুগত্য করো। এছাড়া অন্য কোন কিছুর আনুগত্য করো না। তোমাদের মধ্যে নসীহত গ্রহণের লোক খুবই স্বল্প।

—সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

অতএব নয়—তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আপনাকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মীমাংসায় হাকিম মনোনীত না করবে। অতঃপর আপনি যা কিছু বিচার-ফয়সালা দেবেন, সে ব্যাপারে তারা মনে কোনরূপ সংশয় অনুভব করবে না এবং কায়মনোবাক্যে তা সমর্থন করে নেবে। —সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান-মাফিক যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। —সূরা মায়িদা ঃ ৪৪

এই যদি হয় আল্লাহ্‌র বিধান, আর ইসলামী দেশসমূহের সরকারগুলো এ বিধানকে যদি অকেজো করে রেখে দেয়, তবে এমন সব সরকার সম্পর্কে প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান লোকই বিনা চিন্তায় বলতে পারে যে, এ সরকারগুলো মুসলমানদেরকে কুফরের দিকে আহ্‌বান জানাচ্ছে এবং কুফরী করার জন্য অনুপ্রাণিত করছে।

মিসরে হারাম ঘোষিত বস্তু হালাল

মিসরের সরকারী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। কিন্তু সরকার সুদের আদান- প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতিকে হালাল ও বৈধ করে দিয়েছে। শুধু বৈধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সমগ্র জাতির মধ্যে প্রজাবৃন্দ যাতে করে সুদের দ্বারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, তার জোরালো প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে। অথচ সরকার এ কথা ভাল করেই জ্ঞাত আছেন যে, ইসলাম সুদের সর্বপ্রকার পদ্ধতিকেই হারাম করে দিয়েছে। যেমন আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -

যারা সুদ খায় তারা দণ্ডায়মান হতে পারবে না। কিন্তু ঐ সব লোকদের ন্যায় দণ্ডায়মান হতে পারবে, যাদেরকে শয়তান স্পর্শ করে কুপোকাত করে ফেলেছে। এর কারণ হচ্ছে যে, তারা বলতো সুদ ব্যবসা- বাণিজ্যের ন্যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল এবং সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৫

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং সুদের যা কিছু পাওনা আছে তার দাবি ছেড়ে দাও। এমন করতে সম্মত না হলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন গ্রহণ করবে। তোমরা কারোর উপর জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।

—সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯

এই মিসরেই মদ, জুয়া ও শূকরের মাংস ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে। সরকার নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে এ সব হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং সাধারণভাবে সভা-সমিতিতে এ সব দ্রব্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। অথচ সরকার আল কুরআনের এ ঘোষণাটি ভাল করেই জানে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ –

তোমাদের জন্য মৃত জন্তুর গোশ্‌ত, রক্ত এবং শূকরের মাংস হারাম করা হয়েছে। —সূরা মায়িদা ঃ ৩

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং পাশাখেলা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো পরিহার করে চলো। —সূরা মায়িদা ঃ ৯০

মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

প্রত্যেক প্রকার মাদক দ্রব্যই মদ এবং প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম। এর পরিমাণ বেশি হোক বা কম হোক তা-ও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা মদের উপর, তার পানকারীর উপর, যে পান করায় তার উপর, তৈরিকারীর উপর, ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর, সরবরাহকরী ও বহনকারীর উপর এবং তার দ্বারা অর্জিত কামাই-রোজগার ভক্ষণকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।

আমাদের মিসরীয় সরকার মদ ক্রয় করে তা সরকারী ও পাবলিক অভ্যর্থনা মজলিশে যোগদানকারীদের সম্মুখে পেশ করতে আদৌ লজ্জাবোধ করে না। এমনিভাবেই আমাদের শাসকবৃন্দ উল্লিখিত অভিশাপের পাত্রে পরিণত হয়। এই মিসরীয় সরকারই গান-বাজনা,নৃত্য, ললিতকলা ইত্যাদির মজলিশ করার এবং নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসার ও মদ পান করে অজ্ঞান অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছে। এটা কি নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও হারাম কাজের প্রকাশ্য প্রচারণা নয় ? সরকার কি আল-কুরআনের এ ঘোষণার কোন খবর রাখেন না ?

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا –

ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অত্যন্ত লজ্জাহীন ও খারাপ কাজ।

—সূরা আল-ইসরা ঃ ৩২

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ –

ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা লজ্জাহীন ও অশ্লীল কার্য প্রসার করা পসন্দ করে তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালের জ্বালাময়ী শাস্তি রয়েছে। (এর কারণ ও উপকারিতা) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না।

—সূরা নূর ঃ ১৯

ইসলামের শিক্ষা এত সতর্কতামূলক যে, সতী-সাধ্বী নারী-পুরুষকে অসতী ও ব্যভিচারী নারী পুরুষের সাথে বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কুরআন পাকে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ –

ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী বা মুশরিক নারী ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না। আর ব্যভিচারিণী নারীর ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া অন্য কারোর কাছে বিবাহ দেয়া যাবে না। এরূপ করা মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে। —সূরা নূর ঃ ৩

ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

মিসরের সরকারী ধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও সেখানের মুসলিম শিশু ও যুবকদেরকে বে-দীন বানাবার জন্য বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয় মিশনারীদের প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ অনুমতি দিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীনী-শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ইসলাম ও

মুসলমানদের ইতিহাসের সাথে তাদেরকে পরিচয় করানো হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলোর ইতিহাস তাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন—কালেমা শাহাদাত, নামায প্রতিষ্ঠা,যাকাত আদায়, রমযানের রোযা এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ সমাপণের উপরই ইসলামের ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। ইসলামের এ মৌলিক বিষয়- গুলোর প্রত্যেকটি মুসলমানকে শিক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব, এ কথা কি সরকার জানে না ? কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ -

প্রত্যেক গোত্রের থেকে কোন একটি দল আল্লাহ্র দীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে যখন যাবে, তখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য ঘরের বাহির হয় না ?

—সূরা তওবা ঃ ১২২

মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি দান করেন। আল্লাহ্র দীনের জ্ঞান উপলব্ধির চেয়ে আল্লাহ্র উত্তম ইবাদত আর কোন জিনিসেই নেই। দীনের জ্ঞানে পারদর্শী একজন সুধী হাজার আবেদ লোকের চেয়ে শয়তানের উপর অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি বস্তুরই স্তম্ভ থাকে। এ দীনের স্তম্ভ হচ্ছে এমনকিছু সহজ-সরল, আর উত্তম ইবাদত হচ্ছে দীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করা।

ইসলামের আহবায়কদের উপর অত্যাচার

যে মহান সুধীবর্গ মানুষকে সঠিক ইসলামের দিকে আহ্বান জানায় এবং সরকারকে সর্বপ্রকার অনৈসলমী কাজে বাধা প্রদান করে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সরকার ষড়যন্ত্র করে থাকে। এদের বিরুদ্ধে সে তার ফাসিকী আইনগুলোকে ব্যবহার করে তাদেরকে জবানবন্দী ও কলমবন্দী করে অকর্মণ্য করে রাখে। জেলে নিক্ষেপ করে নানাবিধ জুলম-অত্যাচার তাদের উপর চালিয়ে

যায়। এ সব এ জন্য করা হয় যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ইসলামকে গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানরা অনৈসলামী কাজের মধ্যে নিপতিত থাকুক তা তারা নীরবে সহ্য করতে পারে না। এ সরকার কি এ কথা জানে না যে, সৎ ও ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করা ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব এবং শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যায়, অবিচার ও শরীয়ত গর্হিত কাজকে মিটিয়ে ফেলা প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর ফরয। কালামে মজীদে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر –

তোমরা এমন একটি জাতিতে পরিণত হও, যারা কল্যাণের পানে মানুষকে আহবান জানাবে এবং সৎ ও ন্যায় কাজের হুকুম করবে ও অন্যায়-অসৎ থেকে বিরত রাখবে। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪

মহানবী (স) বলেছেন ঃ

কোন লোক শরীয়ত গর্হিত হতে দেখলে শক্তি প্রয়োগ করে তা পরিবর্তন করে দেবে। এটা সম্ভব না হলে মৌখিক বাক্য দ্বারা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। আর এটাও সম্ভব না হলে তার প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করবে। এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।

শরীয়তী আইন পরিহার

আমাদের সরকার ইসলামের দাবিগুলো এমনভাবে পদদলিত করে চলছে যে, ইসলামের এক-একটি হুকুমকে লঙঘন করতে দ্বিধাবোধ করছে না। ইসলাম যেহেতু যাকাতকে ফরয করে দিয়েছে, সে কারণে সরকার এ আইনটিকে সমাজে অচল করে রাখছে। অপরদিকে এস্থলে সে ইউরোপ ও আমেরিকার শত শত আইন চালু করছে। অথচ এ স্থলে এর চেয়েও উত্তম আইন শরীয়ত থেকে গ্রহণ করা যেতো। সরকার শরীয়তী আদালতগুলোর ইখতিয়ার ও ক্ষমতাকে দিন দিন সংকুচিত করছে। কারণ আদালতগুলোই হচ্ছে ইসলামী আইন প্রয়োগ করার একমাত্র মাধ্যম। ইসলামী আইন ও ফিকাহ্‌র জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার

প্রস্তাব বহুদিন থেকেই সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থও বাজেটে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবকে বার বার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে যে, এ ধরনের সংস্থা স্থাপন করা হলে তা শরীয়তী আইনের প্রাধান্য ও প্রভুত্বের কারণে ঘটবে। আমাদের সরকারের পক্ষে ইসলামের আইন পরিহার করে কুফরী আইন গ্রহণ খুবই সহজ। কিন্তু কুফরী আইনকে পরিহার করে ইসলামী আইন গ্রহণ করা তত সহজ নয় বরং খুব কঠিন ব্যাপার। সরকার এ কথা জানেন না যে, কুরআনের দাবি অনুযায়ী কুফরীর উচ্ছেদকরণ এবং তদস্থলে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম দায়িত্ব এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত শিক্ষার আলোকে সমুদয় সমস্যার সমাধান করা তাদের কর্তব্য। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ- وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا- يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا- وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার হবে এবং নেক আমল করবে তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ দুনিয়ায় খিলাফতের আসনে সমাসীন করবেন, যেরূপ তাদের পূর্বেকার লোকদেরকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করেছিলেন। আর তাদের পসন্দনীয় দীনকে তাদের জন্য অবশ্যই শক্তিশালী করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। (আল্লাহ্ বলেন) তারা আমারই ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে অংশীদার করে না। এর পরও যারা কুফরী করবে তারা ফাসিক। —সূরা নূর ঃ ৫৫

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

তাদেরকে আমি এ জগতে শাসন-ক্ষমতা দান করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ ন্যায়ের হুকুম ও অন্যায়ের বাধা দান করবে। সমস্ত কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ তিনি ফল দেবেন। —সূরা হাজ্জ ঃ ৪১

মিসরের গোলমীর কারণ

মিসর এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। এ দেশটি কিরূপ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলছে এবং ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে কিরূপ এ সংগ্রামে ব্যর্থ হচ্ছে তা এবার লক্ষ্য করুন। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের দেশে একটি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, যার ফলে ১৮৮২ সনে বৃটিশ মিসরের খুদয়ী শাসককে সাহায্যের জন্য এবং জনতার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার বাহানা নিয়ে মিসরে এসে প্রবেশ করেছিল। এর পূর্বে সে বহুবার মিসরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কখনো সাফল্যের মুখ দর্শন করতে পারেনি। মিসর ও ফরাসীয় যুদ্ধের পর ইংরেজরা দ্বিতীয়বার মিসরে প্রবেশ করার পদক্ষেপ নিল। কিন্তু উভয়বারই তারা ব্যর্থ হলো। মুহাম্মদ আলী পাশার যুগে তারা একবার মিসরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদের নাযেহাল করে সাগরে তাড়িয়ে দিয়েছি। সুতরাং তারা ব্যর্থ ও লজ্জিত হয়েই দেশে চলে গিয়েছে। তারা কখনো শক্তিবলে মিসরে প্রবেশ করতে পারবে না একথা ভালরূপে বুঝে নিল। এরপর তারা কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলো। পরিশেষে আরবীয়দের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিল। বৃটিশরাই এ জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিল এবং তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠলো। বৃটিশ দ্বিতীয়বার শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাত নিয়ে মিসরে এসে প্রবেশ করলো। কিন্তু তার আসল ইচ্ছা ছিল মিসরে শাসনতান্ত্রিক প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার করা এবং মিসরের ঘারে চিরস্থায়ীভাবে বসা। তারা এ কথা বহুবারই ঘোষণা করলো যে, তাদের অবস্থান অস্থায়ী। শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই তারা মিসর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তারা সর্বদা মিথ্যা বিবৃতি দিয়েই কালক্ষেপণ করতে লাগলো। এরা মিসরে বসে মিসরের জনসাধারণের ধন-সম্পদ

লুটে নিতে লাগলো এবং তাদের রক্ত চুষতে শুরু করে দিল, মা-বোনদের ইযযত -আবরু ও সম্মান-সম্ভ্রম নিয়ে হোলিখেলা শুরু করলো।

এ ডাকাত দলের আসল ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি প্রকাশ হয়ে পড়লে সমগ্র জাতি তাদের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হলো এবং মিসরীয় জনতা বৃটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দৃঢ় শপথ নিলো। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দও জনতাকে পথ প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করলো। কিন্তু শাসকরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পদলেহন ও ভিক্ষুকের কর্মপন্থা গ্রহণ করলো। তারা অধিকার হরণকারীদের কাছে আশা পোষণ করতে লাগলো যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচারের চেতনা-অনুভূতি জাগ্রত হয়ে স্বয়ং নিজেরাই জুলুম-অত্যাচার হতে বিরত থাকতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাদের এ সুধারণা সরলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যারা ইতিহাস ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ, তারাই এ ধারণা পোষণ করতে পারে। জালিমদের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচারের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকলে এ জগতে প্রভুত্ববাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে আদৌ কোন পরিচয়ই হতো না। স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে মিসরীয় সরকারের চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি শুধু প্রকৃতি ও যুক্তিরই পরিপন্থী ছিল না; বরং ইসলামী শিক্ষারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। আমাদের শাসকবৃন্দ শুভ বুদ্ধি ও দীন ইসলাম দ্বারা পরিচালিত হবার চেষ্টা করলে তাদের কাছে আসল পথটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তারা জানতে পারত যে, সশস্ত্র জিহাদই হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ। জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনার দাবি ইসলাম মাফিক হওয়া কোন বিস্ময়ের কথা নয়। কেননা ইসলাম সম্পর্কে আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا –

এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই মহনবী (স)-ও ইসলামকে প্রাকৃতিক ধর্মের নামে নামকরণ করেছেন।

মানব রচিত আইনের তিক্ত পরিণাম

মিসরে মানব রচিত আইন প্রচলিত হবার ফলে মানবতার যে চরম ক্ষতি ও ধ্বংস এসেছে তা কোন বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনাসম্পন্ন লোকের কাছে গোপন

নয়। এ আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণরূপে অনৈসলামী ছাঁচে গড়ে তুলেছে, যার মধ্যে এখন ইসলামের নাম-গন্ধও অবশিষ্ট নেই। আমাদের শাসক, নেতা ও বিজ্ঞজনদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিরুদ্দেশ হয়ে পড়েছে। তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। একে অপরের নামে দোষারোপ করতে সত্য-মিথ্যার আদৌ কোন ধার ধারে না। ভর্ৎসনা ও গালি-গালাজ করা সাধারণ নিয়ম-অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি লোকই অপরের সম্মানহানি ও তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করতে উদ্যত। প্রত্যেকটি লোক অপরের গলা কেটে ক্ষমতার কণ্ঠহারকে ব্যবহার করার চিন্তায় নিমগ্ন। ঘৃণিত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার এমন দুষ্ট পথ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই। এরা নিজেদের মান-সম্মানকে টুকরা টুকরা করে পদদলিত করে আগত বংশধরদের জন্য কলুষিত চরিত্রের অত্যন্ত ঘৃণিত উদাহরণ স্থাপন করছে।

যেই আদল, ইনসাফ ও সুবিচারের মানদণ্ডটি নিকটতম ও দূরতম আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শত্রু-মিত্র সকলের জন্য একইরূপ সমান ছিল, সেই আদল-ইনসাফ 'ইসলাম জগতের' কপাল হতে বিদায় নিয়েছে। আমাদের কাছে শুধু আদল-ইনসাফের নামটিই অবশিষ্ট আছে, এছাড়া কিছুই নেই। তার স্থানে আজ পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি রাজনৈতিক গ্রুপ অপর গ্রুপকে পদদলিত রেখে নিজে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হবার চেষ্টায় চিন্তিত। প্রত্যেকটি ক্ষমতাসীন লোক নিজ অনুসারীদের সম্মুখে দুশ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চলছে। তাদেরকে এজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা নিজদের পূর্ববর্তী দুষ্ট নেতাদের দুষ্কার্যকে সনদরূপে পেশ করে। এমনিভাবে একটা দুষ্টামী আর একটা দুষ্টামীর বৈধতার সনদ সংগ্রহ করে দিয়ে চলছে। আমরা এহেন নষ্টামী-দুষ্টামী, আত্মঘাতী চরিত্র ও দুর্বল ঈমানের অন্ধকার কুয়ার মধ্যে নিপতিত। আমাদের কাছে এমন কোন আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-আদর্শ বর্তমান নেই, যার অনুসরণকে আমরা অপরিহার্য মনে করি। প্রবৃত্তির খায়েশই আমাদের প্রভু হয়ে পড়েছে। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে পড়েছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ক্ষমতার পূর্বাকাশে যখনই কোন সূর্য উদয় হয়, তখনই মানুষ তার সম্মুখে মস্তক অবনত হয়ে সিজদায় পড়ে যায়। আর

পশ্চিমা ভেলায় রক্তিম আবিরের মাঝে যখন তার জীবনায়ু শেষ হয় তখন তারা তার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বস্তুতে পরিণত করে।

শাসক শ্রেণী যেহেতু বাহ্যিক প্রদর্শন ও দুশ্চরিত্রের দূরারোগ্য রোগের কবলে নিপতিত, সেহেতু সমগ্র জাতির মধ্যে সাধারণভাবে এ রোগ সংক্রামিত ও সম্প্রসারিত হয়ে চলছে। শুধু ছোট্ট একটি শ্রেণী রয়েছে যাঁরা দুশ্চরিত্রের এহেন প্রকট সয়লাবের মুখে তাকওয়া ও চরিত্রের আঁচলকে দৃঢ়ভাবে ধরে আছে। যে কথা শুনলে দেশ দরদী প্রতিটি লোকের অন্তঃকরণ কান্নায় ভেঙ্গে না পড়ে পারে না, তা হচ্ছে আমাদের যুবক ও শ্রমজীবী লোকেরা আত্মিক সম্মান, দায়িত্ববোধ ও দরদী মন ইত্যাকার মানবীয় সৎ গুণাবলী হতে মানুষের আঁচল শূন্য থাকাটাকেই তামুদ্দনিক উন্নতি ও প্রগতি মনে করে থাকে। তারা ভদ্র ও চরিত্রবান লোকদেরকে দেখে বলে, "এরা হচ্ছে সেকেলে মানুষ। এদেরকে কিছু বলো না।"

জাতির এ উদীয়মান যুবকদল দীন-ঈমান ও ইলম-আমল থেকে সম্পূর্ণ শূন্য। এরা সর্বদা আয়না-চিরণী নিয়ে কেশ বিন্যাস এবং নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাট্যকরণে নিমগ্ন থাকে। এদের এবং নাট্যাভিনয়-কারীদের পোশাকে কোনই তারতম্য নেই। জীবনের লাগামটিকে যৌন লাম্পট্যের ঘোড়ায় জুড়ে নিয়ে এরা অলি-গলিতে অপমানিত হচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ কমিউনিজমের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যে, বাসা-বাড়িতে এদের যথাযথ তরবিয়ত প্রশিক্ষণ হচ্ছে না এবং স্কুল-কলেজেও এরা এমন শিক্ষা পাচ্ছে না, যা তাদেরকে ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা ও নাস্তিকতাবাদী দর্শন থেকে রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে গর্হিত ও দুষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণের সহযোগী প্রতিটি কাজকর্মই জাতির জন্য বৈধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, আত্মবিক্রয়ই নয় বরং গোটা দেশ ও জাতিকে বিক্রয় করাও বৈধ হয়ে গিয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, এর বিনিময় গদি ও হালুয়া-রুটি পেতে হবে।

প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেতনার পরিবর্তে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অপরের কাছে যা কিছু আছে তা নিজের হোক—এটাই চায়। চাষীরা জমিদারের সাথে, শ্রমিকরা কারখানার মালিকদের

সাথে, গরীবরা ধনীদের বিরুদ্ধে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছে। হিংসুকরা সর্বদাই এই আসা পোষণ করে যে, অপরের কাছে যা কিছু আছে তা নিজের হোক। হক না হক, বৈধ-অবৈধতার কোন প্রশ্ন তাদের কাছে নেই। বিনা পরিশ্রমে আসুক না কেন—তাতেও তাদের কোন আপত্তির কারণ নেই। একদিকে সম্পদের অঢেল স্তূপের মধ্যে ধনীরা গড়াগড়ি খাচ্ছে, অপরদিকে গরীবরা দারিদ্র্য বুভুক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে ধুকে ধুকে মরছে। কিন্তু ধনীদের সম্পদে গরীবদের যে অধিকার শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা পূরণ করা উচিত—এতটুকু চেতনাবোধ ধনকুবেরদের মধ্যে উদয় হচ্ছে না। কথায় বলে চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।

আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা শুধু গরীব- মিসকিনদের অধিকার আদায় করে দিতে অপারগই নয়; বরং এ আইন ব্যবস্থা উল্টো পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলছে। একদিকে ধনকুবের দল জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখনাগুলোর দখল নিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে। অপরদিকে মেহনতি জনতা দেহের রক্ত পানি করে দিচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে শুকনো রুটির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার অথবা পুরানো টুটাফাঁটা কাপড় দ্বারা ইযযত-আবরু রক্ষা করার সংস্থানও খুঁজে পাচ্ছে না! শরীয়তের যে আইন ধনীদের থেকে গরীবদের হক ও অধিকার আদায় করে দিতে পারে , সে আইন আজ অচল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একজন সম্পদ দু'হাতে লুটে ঝোলায় ভরছে, অপরজন হিংসা-বিদ্বেষের তূষের আগুন বুকের মাঝে লালন করে চলছে।

আমাদের সামাজিক আইনগুলো স্বার্থ উদ্ধার ও অবাধ অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে ছোটদের মধ্যে বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মনোভাব পাওয়া যাচ্ছে না। আর বড়দের মধ্যে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মায়া-মমতার লেশমাত্রও দেখা যায় না। সবলেরা দুর্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করছে না এবং ধনীরা গরীবদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হচ্ছে না। জনগণের দৃষ্টিতে শাসকরা আজ ঘৃণিত এবং শাসকদের দৃষ্টিতে জনগণ আজ শাসিত ও লাঞ্ছিত। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থাপনাও আজ ভেঙ্গে পড়েছে। স্বামী স্ত্রী হতে পৃথক, পুত্র পিতা থেকে দূরে এবং ভাই ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। এমনটি

হবে না কেন ? আমাদের জীবনের ভিত্তিমূল যখন স্বার্থ উদ্ধার ও স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। আজ আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঘুণে ধরেছে। মিসরে আজ প্রত্যেকটি বস্তু নিলামে বিক্রয় হচ্ছে। সরকারী মসনদের একটি মূল্য আছে। শক্তি, ক্ষমতা ও মান-সম্মানেরও একটি মূল্য রয়েছে। আর রয়েছে দুর্বল ও দারিদ্র্যেরও মূল্য। এখানের প্রত্যেকটি লোকই হক-বাতিলের জন্য যা কিছু করতে ইচ্ছুক হোক না কেন; বিনিময় মূল্যটা সর্বাগ্রে পাবার জন্য উদগ্রীব। সুতরাং এ দেশে যারা মহত্ব ও মনুষ্যত্বের মূল্য দীনারে মেটাতে অক্ষম বা এ ধরনের সওদাবাজী করতে প্রস্তুত নয়, তারাই হচ্ছে বঞ্চিত, হতভাগ্য ও ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকারে পরিণত।

লজ্জাকর ঘটনাবলী

বর্তমানে আমাদের মিসরে এমন সব লজ্জাকর ও অপমানজনক ঘটনা ঘটে চলছে, কিয়ামত পর্যন্ত যার প্রতিটি ঘটনাই আমাদের মস্তককে লজ্জায় অবনমিত করার জন্য যথেষ্ট। একদিনের পত্রিকার খবর বলছি। পত্রিকাটির পৃষ্ঠাগুলো কেবল এমন সাতটি দুর্ভাগ্যজনকই নয়; বরং লজ্জা ও অপমানজনক ঘটনার বিবরণে ভরপুর—যার কথা মুখে আনতেও দ্বিধা হয়। এর একটি ঘটনা হচ্ছে সামরিক মামলার রায়, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশ্চিম মরুভূমি হতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার মামলা, তৃতীয়টি হচ্ছে রাসেলের আদালতে চা ও কাষ্ঠ ইত্যাদি আত্মসাৎ করার মামলা, চতুর্থ, শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ আত্মসাতের মামলা,পঞ্চম ইসরাঈলকে মোটরগাড়ী সরবরাহের মামলা,ষষ্ঠ স্বাস্থ্য দফতর কর্তৃক ভূমি ক্রয়-বিক্রয় মামলা, সপ্তম, জেলখানার কয়েদীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতনের মামলা। ঘটনাগুলির বিবরণ সত্যই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক। এ ঘটনাবলীর প্রতিটি ঘটনাই জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর এবং দেশের মান-ইযযত ও সুনামের পরিপন্থী। এ ঘটনাবলী এ কথাই প্রমাণ করে যে, ক্ষমতাসীন শাসকবৃন্দ দীন-ঈমানকে হারিয়ে ফেলেছে, আমানতদারীকে খেয়ানত- দারীতে রূপান্তর করেছে। তারা এমন অপরাধ করছে যা কখনো বিস্মৃত হবার নয় এবং ক্ষমার যোগ্যও নয়। একজন অপরাধীকে তার অপরাধ প্রমাণের পূর্বে ধমক দান শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার কারোর নেই। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশী করা যেতে পারে। শাসকদের হাতের ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহ্ ও জনগণের আমানত এবং

একজন অপরাধীও তাদের কাছে আমানতস্বরূপ। মারপিট করে অপরাধের স্বীকারোক্তি নিলে তারা নিজেরাই খেয়ানতের অপরাধে অপরাধী। কারণ ইনসাফ ও সুবিচারকে তারা নিজ হাতেই নষ্ট করছে। শাস্তি দেওয়ার এ ধরনের দু'একটি ঘটনা হলে তা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে কিন্তু সমগ্র শাসনযন্ত্রটিতে যদি এহেন দুষ্কার্য ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে নানাবিধ শাস্তি দেওয়ার জন্যে উৎসাহ যোগায়, তবে এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ও অমার্জনীয় অপরাধ। সরকারের চোখের সামনে, তাদের নাকের ডগার উপর দিবারাত্র, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এহেন জুলুম-অত্যাচার চলতে থাকার অর্থ হচ্ছে এ দেশ থেকে আইন ও শাসন-শৃঙ্খলা বিদায় হওয়া বিচার-ইনসাফের দাফন হওয়া। এ দেশে জানোয়ার ছাড়া কিছুই নেই, চতুর্দিকে জানোয়ারের দৌরাত্ম্য চলছে এবং জানোয়ারদের হাতে মানবতার অধিকারের মানদণ্ডটি সোপর্দ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

এসব ঘটনা আমাদের দেশের মান-ইযযত ও সুনামকে ক্ষত-বিক্ষত করছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্যাদার প্রতি আঘাত হানছে।

এ সব ঘটনার বিরুদ্ধে দেশবাসীর সোচ্চার হওয়া দেশেরই দাবি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থার অবসান না হয় এবং অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, যা বাস্তবিকই ধ্বংসাত্মক। এমন উদারতা সম্প্রসারণ হচ্ছে যা সত্যিই জাতির জন্য মারাত্মক রোগ। জুলুম-অত্যাচারের এমন দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়েছে, যার কারণে আমাদের ঐক্য ও শান্তি চুরমার হয়ে যাবে। এখানে গরীব ও ধনীদের মধ্যে, শাসক ও জনতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির স্থান দখল করে নিয়েছে সংঘর্ষ ও শত্রুতা। মিসর বর্তমানে যেই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছে তা থেকে উদ্ধার করার একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই আত্মিক উজ্জীবন, পবিত্রতা ও অবস্থার সংসোধনের একমাত্র নিশ্চয়তাদানকারী। জাতিকে ঐক্য-সংহতি শান্তি ও শৃঙ্খলার একই মালায় গেঁথে দিতে পারে যে শক্তি তা ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

জিহাদ

ইসলাম অপমান বরদাশ্‌ত করে না

এ দুনিয়ার মুসলমান অধীনস্থ হয়ে থাকুক—ইসলাম তা আদৌ পসন্দ করে না। একজন মুসলমান কেবল একজন মুসলমানের বেলায়ই কোমল ও বিনয়ী হতে পারে। ইসলামের শত্রুদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন বৈধ নয়। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ –

মু'মিনদের বেলায় তারা কোমল ও বিনয়ী, কাফিরদের বেলায় তারা অত্যন্ত কঠোর। —সূরা মায়িদা ঃ ৫৪

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ –

মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর সাথে যারা থাকেন তাঁরা কাফিরদের বেলায় অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পরে অতি দয়ালু।
—সূরা আল-ফাত্‌হ ঃ ২৯

মূলত এ জগতে মুসলমানের মর্যাদা অবমাননা ও পরাজিত হয়ে থাকা নয়। বরং সম্মানিত ও বিজয়ী হয়ে থাকাই হচ্ছে তাদের আসল মর্যাদা। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ–

মর্যাদা তো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা এটা অবগত নয়। —সূরা মুনাফিকুন ঃ ৮

মুসলমানরা তাদের এ মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং আস্থাশীল থাকবে—এটাই ইসলামের দাবি। আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে তাঁরা সত্যে পরিণত করে দেখান এবং আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত মর্যাদায় মুসলিম মিল্লাতকে প্রতিষ্ঠিত করাকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্যবিন্দুতে পরিণত করাকে ইসলাম মুসলমানদের

জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। মুসলমানদের এ মর্যাদা হচ্ছে তালীম, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মর্যাদা। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس -

এমনিভাবে আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী জাতিরূপে এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের উপর সাক্ষী হতে পারো।

—সূরা বাকারা ঃ ১৪৩

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

তোমরা হচ্ছো একটি উত্তম জাতি। তোমাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে ও আস্থাশীল হবে। —সূরা-ইমরান ঃ ১১০

হিজরত

ইসলামের এ শিক্ষার দাবি হচ্ছে মুসলমানরা যে দেশে ও যে সমাজে নেতৃত্বের সম্মান নিয়ে বিজয়ী বেশে থাকার পরিবেশ নেই এবং যেখানে এমন উপায়-উপকরণও বর্তমান নেই যার দ্বারা তারা সামাজিক জীবনে সম্মান ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—এহেন অবস্থায় সে দেশ ও সমাজ পরিত্যাগ করে এমন দেশ ও সমাজে চলে যেতে হবে, যেখানে এসব উপায়-উপকরণ পাওয়া যায় বা পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিদ্যমান। এমন লোকদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার দিয়ে রেখেছেন। যদি এহেন দেশ ও সমাজ অনুসন্ধানে তাদের জীবন শেষ হয়েও যায় তবু তাদের প্রতিদান কখনোই নষ্ট হবে না। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة-

ومن يخرج من بيته مهجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله -

যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, তারা এ দুনিয়ায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের পানে মুহাজির হয়ে ঘর থেকে বের হয়, আর এ অবস্থায়ই যদি তাদের মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের প্রতিদান লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো।

—সূরা নিসা ঃ ১০০

যদি কোন মুসলমান অপমান-অবমাননা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে, অথচ হিজরত করার ক্ষমতা তার বর্তমান, এর চেয়ে বড় জালিম কোন লোক থাকতে পারে না। ইসলামের দাবি তার কোনই কাজে আসবে না। কারণ সে নিজেই অপমান-অবমাননা ও হীনতার রশি গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে। স্থায়ীভাবে সে এহেন অপমান দীনতা-হীনতার মধ্যে নিপতিত থাকুক- ইসলাম আদৌ তার অনুমতি দেয় না। ইসলাম মুসলমানদেরকে অমুসলিম সমাজ হতে যথাসম্ভব শীঘ্র বের হবার অনুমতি দিয়েছে। কেননা অমুসলিম সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ এবং সর্বদা অমুসলিমদের অনুগত ও অধীনস্থ হয়েই সেখানে বসবাস করতে হয়। অথচ মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কারোর অধীনতা স্বীকার করতে পারে না। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ- قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ- قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ- وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا- فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا -

যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করতো, তাদের রূহ কবজ করার সময় ফেরেশতারা তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলো—তোমরা দুনিয়ায় কি অবস্থায় ছিলে ? তারা জবাব দিলো আমরা দুনিয়ায় অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতারা জবাবে বললো, কেন আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না ?

তোমরা অন্যত্র হিজরত করে গেলে না কেন ? সুতরাং এ ধরনের লোকদের ঠিকানা হচ্ছে অত্যন্ত অপমানজনক জাহান্নাম, তাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান খুবই খারাপ। কিন্তু নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বলতার দরুন হিজরত করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোথাও যাবার পথ পায় না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রাখবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী। —সূরা নিসা ঃ ৯৭-৯৯

মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

যারা পৌত্তলিকদের সমাজে বসবাস করে, তাদের ব্যাপারে আমি দায়িত্বমুক্ত। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ। কেন আপনি দায়িত্বমুক্ত হলেন ? মহানবী (স) জবাব দিলেন, এদের উনানগুলো কাছাকাছি দেখো না ? অর্থাৎ এদের জীবন যাপন ও বসবাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত। যে লোকের চলাফেরা ও আসা-যাওয়া পৌত্তলিকদের সাথে হয় এবং তাদের সাথেই বসবাস করে সে লোক তাদের মতই। তওবার দরজা যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরতের ধারা শেষ হবে না। আর তওবার দরজা বন্ধ হবে না, যখন পর্যন্ত পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় না হবে।

ইসলাম জালিমের সাথে আপস করে না

ইসলাম জালিম ও অত্যাচারীর সামনে নীরবতার ভূমিকা পালনের অনুমতি দেয় না। এদের সাথে সে আপস করতে জানে না। অন্যায়- অবিচার, জুলুম-অত্যাচারের সম্মুখে আল্লাহ্‌র বান্দারা মাথা অবনত করে নতজানু হয়ে বসে থাকুক ইসলাম এমন শিক্ষা দেয় না। ইউরোপীয়রা আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে, এবং আমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা নীরব দর্শকের ন্যায় সহ্য করে থাকি—এমন শিক্ষা ইসলাম আমাদেরকে দেয় না। বরং আমাদের হরণ করে নিয়ে যাওয়া অধিকার ও হক ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এবং শত্রুর সকল অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রজাল ব্যর্থ করে না দেওয়া পর্যন্ত শক্তির মুকাবিলায় শক্তি, অস্ত্রের মুকাবিলায় অস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশে নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল ইসলামী শাসন ক্ষমতা আল্লাহ্‌র ঈমানদার বান্দাদের হাতে ফিরে না আসে, ততক্ষণ এ সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কালামে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ- فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ-

সম্মানিত মাসের পরিবর্তে হচ্ছে সম্মানিত মাস এবং এ সম্মানিত মাসগুলোতে শরীয়তের দণ্ডবিধান কি প্রযোজ্য হতে পারবে ? সুতরাং যদি তোমাদের উপর কেউ অত্যাচার করে তবে তোমরাও ততটুকু পরিমাণ প্রতিশোধমূলক অত্যাচার করো যতটুকু তোমাদের উপর করা হয়েছে।

—সূরা বাকারা ঃ ১৯৪

وَجَزٰؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -

খারাপ কাজের প্রতিদান অনুরূপ খারাপই। —সূরা শুরা ঃ ৪০

জিহাদ করা ফরয

ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন। এ জিহাদে শুধু দৈহিক শক্তি ব্যবহার করলে চলবে না বরং জান-মালসহ সর্ববিধ উপায়-উপকরণ এ পথে নিয়োজিত করে জিহাদ করতে হবে। আল-কুরআনে জিহাদের ঘোষণা খুব তাকিদের সাথে বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

(ইসলামের শত্রুর সাথে) লড়াই করা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। অথচ তোমরা লড়াই করাকে পছন্দ করো না। তোমরা যে জিনিস অপছন্দ করো হয়তো তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর ও উত্তম কাজ বলে প্রমাণিত হবে। —সূরা বাকারা ঃ ২১৬

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ -

যারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসে, তোমরা তাদের সাথে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করো। —সূরা বাকারা ঃ ১৯০

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ –

যতক্ষণে (দুনিয়া হতে) ফিতনা-ফাসাদ ও কলহ-বিবাদের অবসান হয়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠা না হয় (অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়) ততক্ষণ উহাদের সাথে লড়াই করো।

—সূরা আনফাল ঃ ৩৯

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

ওদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো। তেমাদেরকে যেরূপ বহিষ্কার করেছে, তোমরাও তাদেরকে তদ্রূপ সেখান হতে বহিষ্কার করো।

—সূরা বাকারা ঃ ১৯১

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ

যারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের বিনিময়ে বিক্রয় করে তাদের উচিত আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করা। —সূরা নিসা ঃ ৭৪

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ –

তোমাদের কি হলো যে তোমরা দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছো না ? —সূরা নিসা ঃ ৭৫

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ- اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا –

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে। আর যারা কাফির; তারা সংগ্রাম করে তাগূত বা আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির অনুকূলে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে সংগ্রাম করে যাও। মনে রেখ! নিঃসন্দেহে শয়তানের কারসাজি ও অভিসন্ধি দুর্বলই হয়। —সূরা নিসা ঃ ৭৬

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হালকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়ে পড়ো। আর নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো।

—সূরা তাওবা ঃ ৪১

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً-

তোমাদের সাথে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যেরূপ মুশরিকরা লড়াই করে তোমরাও সর্বশক্তি নিয়োগ করে তদ্রূপ ওদের সাথে লড়াই করে যাও।

—সূরা তাওবা ঃ ৩৬

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ -

যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন,তা হারাম মনে করে না, তাদের সাথে লড়াই করে যাও। —সূরা তাওবা ঃ ২৯

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ- ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে সেই বাণিজ্যের কথা বলে দেব, যা তোমাদেরকে জ্বালাময়ী শাস্তি হতে মুক্তি দেবে ? তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ইমান আন। আর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম পথ—যদি তোমরা জানতে। —সূরা সাফ্‌ফ ঃ ১০-১১

জিহাদ কোন অবস্থায় ফরযে আইন অর্থৎ প্রতিটি লোকের উপর ফরয এবং কোন অবস্থায় ফরযে কিফায়া অর্থাৎ কিছু লোকের প্রতি ফরয—এ বিষয়ে

ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও নিম্নলিখিত অবস্থায় জিহাদ সকলের উপর ফরয।

১. ইসলামী সেনাবাহিনী ও কাফির সেনাবাহিনীর মধ্যে যখন নিয়ম-তান্ত্রিকভাবে ফ্রন্টে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন লড়াই করে যাওয়া প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর ফরয। কমাণ্ডারের বিনা অনুমতিতে পশ্চাদপসরণ করা হারাম। কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا –

হে ঈমানদারগণ! যখন শত্রুবাহিনীর সাথে তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তোমরা দৃঢ়পদে ময়দানে দণ্ডায়মান থাক। —সূরা আনফাল ঃ ৪৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ –

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা (পরিখা খনন করে এবং কাতারবন্দী হয়ে) কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন তোমরা পশ্চাদপদ হয়ো না। —সূরা আনফাল ঃ ১৫

২. রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক যখন যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়, অর্থাৎ যখন যুদ্ধ-সক্ষম প্রতিটি লোককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জনানো হয়, তখন মুসলমানদের উপর যুদ্ধ ফরযে আইন হয়। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ –

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হলো কি যে যখন তোমাদের আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য বের হবার আহবান জানানো হয়, তখন তোমরা মাটির সাথে লেগে থাক ? অর্থাৎ বের হও না ? —সূরা তওবা ঃ ৩৮

মহানবী (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদেরকে জিহাদের আহবান জানানো হয়, তখন তোমরা সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

৩. কাফির বাহিনী যখন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তখন সেই দেশের সকল অধিবাসীর প্রতি জিহাদ ফরযে আইন হয়। কেননা কুরআন পাকের

ঘোষণা হচ্ছে—ফিতনা থাকা অবধি জিহাদ চালিয়ে যাও। সুতরাং মুসলিম দেশ কাফিরদের দখলে চলে যাওয়ার চেয়ে বড় ফিতনা কিছুই থাকতে পারে না। ইসলামী আইনবিদগণ লিখেছেন যে, কাফির বাহিনী মুসলিম দেশ দখল করে নিলে বা দখল করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলে সকল মুসলমানের প্রতি জিহাদ ফরয হয়। কোন কোন আইনবিদের মতে এমতা- বস্থায় নারী, বৃদ্ধা, রুগ্ন ও অপারগ ব্যক্তিদের উপরও জিহাদ ফরয হয়। অথচ সাধারণভাবে নারীদেরকে জিহাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত রাখা হয়েছে।

যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

"আমি মহানবী (স)-র কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! নারীদের জন্য জিহাদ ফরয কিনা ? জবাবে তিনি বললেন, তাদের উপর সেই জিহাদ ফরয যেখানে মারামারি ও হানাহানি নেই অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা পালন করা।"

জিহাদের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি

যুদ্ধের আহবানে সাড়া দেওয়া এবং সুযোগ এলে পিছু না হটা মুসলমানের উপর কেবল ফরয নয়; বরং তাদের সর্বদা জিহাদের জন্য সজাগ থাকা, অস্ত্রে শান দিয়ে প্রস্তুত থাকা এবং এতটুকু পরিমাণ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে শত্রুদলের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার চিন্তাও মনে না আসে। কালামে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا–

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের নিরাপত্তার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রাখো। অতঃপর দলে দলে সকলে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়ো।

—সূর নিসা ঃ ৭১

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ– لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ– اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ –

যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব তোমরা শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেই ঘোড়া সাজিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় প্রস্তুত থাকো, যে ঘোড়া দ্বারা তোমরা আল্লাহ্র দুশমন ও তোমাদের দুশমনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে। এ ছাড়া অন্যান্য শত্রুকে তোমরা ভীতি প্রদর্শন করবে, যাদেরকে আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

—সূরা আনফাল ঃ ৬০

এদিক দিয়ে যুদ্ধের শক্তি ও কলা-কৌশল, উপায়-উপকরণ, সাজ- সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। সামরিক প্রশিক্ষণ; তীর, লাঠি, তলোয়ার, আগ্নেয় অস্ত্র জাতীয় বন্দুক, রাইফেল, সাঁজোয় গাড়ী, কামান, হাওয়াই, ট্যাঙ্ক, হাওয়াই জাহাজও সামুদ্রিক যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি পরিচালনাও প্রস্তুতির মধ্যে শামিল। কুস্তিগীরি, শরীর চর্চা, তীরন্দাযী ও ঘোড়দৌর ইত্যাদি কাজও এর অনুবর্তী। এ জন্য অস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম শিল্পের কাজও মুসলমানদের হাতে সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন।

"মনে রেখো। শক্তি সঞ্চয় করার কথা যে কুরআনে বলা হয়েছে, তার মধ্যে তীরন্দাযী ও লক্ষ্যবিন্দুভেদ অভিযান পরিচালনার কাজও শামিল। দুর্বল ও কমজোর মুসলমানদের তুলনায় শক্তিশালী মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রশংসনীয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা একটি তীরের বিনিময় তিনজনকে বেহেশতে দাখিল করবেন। যে সৎ উদ্দেশ্য এটাকে প্রস্তুত করেছে, যে এটাকে ব্যবহার করেছে এবং যে লোক ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে, এরা সকলেই জান্নাতী। লক্ষ্যবিন্দুভেদ অভিযান ও তীরন্দাযী শিক্ষা করা আমার নিকট অতি প্রশংসনীয় কাজ। যে লোক তীরন্দাযী শিক্ষা করে তা পরিত্যাগ করেছে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

তোমরা কয়েকটি দেশই জয় করবে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাযী শিক্ষা করা পরিত্যাগ না করে।

মহানবী (স) নিজেই উট ও ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজের সামনে এদের প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে এ ধরনের কর্মতৎপরতায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। কোন এক সময় তীরন্দাযী প্রতিযোগিতায় স্বয়ং মহানবী (স) এক গ্রুপের সাথে শামিল হলে দ্বিতীয় গ্রুপের লোকেরা বললো, আমরা প্রতিপক্ষের উপর কেমন করে তীর চালাবো, যখন সে পক্ষে মহানবী (স) দণ্ডয়মান ? তখন হুযূর (স) জবাব দিলেন 'তীর চালাও। আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি।' হুযূরের কর্ম-চরিত্র দ্বারা কুস্তিগীরি ও তীরন্দাযী প্রমাণিত।

জিহাদের প্রতিদান

ইসলামে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার বিনিময়ে মহান প্রতিদানের অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে। মহানবী (স) এ প্রতিদানকে 'ইসলামের তাজ' বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে জিহাদের প্রতিদানের ঘোষণা আল-কুরআনের ভাষায় উল্লেখ করছি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ -

যারা ঈমানদার হয়ে হিজরত করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা পোষণ করে। —সূরা বাকারা ঃ ২১৮

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ- أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ- وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ -

যাঁরা ঈমানদার হয়ে আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল দিয়ে হিজরত ও জিহাদ করেছে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের মর্যাদার আসন অতি মহান এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম। —সূরা তাওবা ঃ ২০

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ-

যদি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে মারা হয় বা মরে যাও, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের জন্য প্রতিদান হচ্ছে তার মাগফিরাত ও রহমত। এ প্রতিদান তারা যা কিছু গচ্ছিত করে রাখছে তার চেয়ে অতি উত্তম।
—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا- بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ-

যারা আল্লাহ্‌র পথে মারা গিয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত ভেবো না বরং আল্লাহ্‌র দরবারে তারা জীবিত। তাঁর দরবার থেকেই তারা রিযিক পেয়ে থাকেন। —সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا

وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ- ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ -

যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং আমার পথে যাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর যারা লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের গুনাহরাশি আমি মিটিয়ে ফেলবো এবং এমন সুসজ্জিত জান্নাতে দাখিল করবো, যার তলদেশ হতে নহর প্রবাহিত হয়েছে। এসব কিছু তাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান।

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ- يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-

আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। এরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে, শত্রুকে হত্যা করে ও নিজেরা শত্রুর হাতে নিহত হয়। —সূরা তাওবা ঃ ১১১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ- وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ -

যারা (আল্লাহ্‌র পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজ হতে সাতটি ছড়া হলো, প্রতিটি ছড়ায় শতটি করে দানা জন্ম নিলো, এর চেয়েও আল্লাহ্‌ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছা দ্বিগুণ প্রতিদান দেন।

—সূরা বাকারা ঃ ২৬১

মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

আমি তোমাদেরকে কি সবচেয়ে উত্তম লোকের সংবাদ দেব না? সাহাবাগণ জবাব দিলেন, কেন দেবেন না ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ? মহানবী (স) ইরশাদ করলেন, যে সকল মানুষ নিজের ঘোড়া জিহাদের জন্য মারা না যাওয়া পর্যন্ত প্রস্তুত রাখে তারাই উত্তম লোক।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

আল্লাহ্‌র পথে একদিনের পাহারা দুনিয়া ও উহাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

১৯৩৬ সনের চুক্তি

মিসর ১৯১৯ ইং সন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন চলে আসছে। ষোল বছর পর্যন্ত ইংরেজদের দুয়ারে স্বাধীনতা ভিক্ষার পর ১৯৩৬ সনে ইংরেজরা খুশি হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য এগিয়ে এলো, যাকে আমরা সৌজন্যমূলক চুক্তি ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করতে পারি না। আসলে এ সরলতা ছিল তাদের ষড়যন্ত্র ও কুমতলবেরেই নিকৃষ্টতম প্রদর্শনী। এ চুক্তি অনুসারে আমরা এ কথা স্বীকার করে নিয়েছি যে, আমাদের স্বাধীনতার পাহারাদার ও ইজারাদার হচ্ছে বৃটিশ। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ চুক্তিটি মরুভূমির মায়া-মরীচিকা ও অর্থহীন চুক্তি ছাড়া কিছুই ছিল না। এ চুক্তির মধ্যে যে সব শর্ত আমাদের জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপকারী ছিল, তা এক এক করে বৃটিশরা সবই লঙঘন করেছে। যেমন এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল যে, বৃটিশরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। এ শর্তের বিরোধিতা করার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৯৪৮ সনে মিসর সরকারের কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমীন পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করার দাবি পেশ করা। চুক্তিতে আর এক শর্ত ছিল—দু'টি রাষ্ট্রের কোন একটি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে অপরটি সম্ভাব্য সর্ববিধ সাহায্য করবে। আমরা তাদেরকে যুদ্ধে যাবতীয় সহায়তা করেছি কিন্তু ইয়াহূদীদের সাথে যখন আমাদের যুদ্ধ বাধলো তখন বৃটিশরা অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও মূল্যের বিনিময়ে অস্ত্র দিতেও অস্বীকার করল। ১৯৪৮ সনে মিসরীয়দের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও হিংসা-বিদ্বেষের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। এর ফলে মিসর হতে বৃটিশের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। এ অবস্থা সৃষ্টির পেছনে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। বৃটিশরা দ্বিতীয়বার মিসরীয় সরকারকে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করতে আরম্ভ করলো। সুতরাং সরকার শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করার ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে নিজের ভাইকে অত্যাচার-অবিচারের শিকারে পরিণত করলো, তাদেরকে অন্ধকারময় বন্দিশালায় প্রেরণ করে তাদের জান-মাল ও ইযযত-আবরুর উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতে লাগলো। তারা অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে এমন বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করলো যার কথা মনে হলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব হারাম

একজন মুসলমানের ভূমিকা সর্বদা একমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাফিরদের স্বার্থ রক্ষা আদৌ তাদের উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়া উচিত নয়। ইসলামের নীতি মাফিক মুসলমানের বন্ধু হচ্ছে একমাত্র মুসলমানই। আর কাফিরদের বন্ধ হচ্ছে কাফিররাই। দুনিয়ার সমগ্র মুসলমান এক উম্মত ও এক জাতি। আর দুনিয়ার সকল কাফির মিলে এক জাতি। পবিত্র কালাম মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً –

তোমাদের এ জাতি একই জাতি। —সূরা মু'মিনুন ঃ ৫২

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ –

সমস্ত মু'মিন হচ্ছে পরস্পর ভাই ভাই। —সূরা হুজুরাত ঃ ১০

ইসলাম অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করার কারণ হলো এর ফলে মুসলিম জামা'আতের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা, দলাদলি ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। যে সকল অমুসলিম মুসলমানদের সাথে লড়াই করে না অথবা অত্যাচার-অবিচার করে না, ইসলাম এ অমুসলিমদের সাথে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার ও ন্যায়-নীতির আচরণ প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছে, অত্যাচার-অবিচারের ভূমিকা নিয়েছে, তাদের সাথে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও মিলমিশ রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ। আল-কুরআন এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে তুলে ধরেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً –

মু'মিনকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের সাথে মু'মিনরা বন্ধুত্ব করে না। যারা এমন করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তোমরা তাদের থেকে পরহেয করে চলো। —সূরা আলে 'ইমরান ঃ ২৮

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ –

মু'মিন নারী-পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। —সূরা তাওবা ঃ ৭১

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

কাফিরগণ একে অপরের বন্ধু। —সূরা আনফাল ঃ ৭৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -

হে ঈমানদারগণ! য়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা এদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তারা ওদের মধ্যে শামিল। —সূরা মায়িদা ঃ ৫১

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ -

তোমাদের বন্ধু হলেন আল্লাহ আ'আলা এবং তাঁর রাসূল।
—সূরা মায়িদা ঃ ৫৫

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا -

যারা মু'মিন লোকদের ব্যতীত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা কি তাদের কাছে প্রভাব-প্রতিপত্তি চায়? (মনে রেখো) নিশ্চিতরূপে সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। —সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের দুশমন ও আমার দুশমনদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না। তোমরা এদের কাছে ভালবাসা প্রকাশ কর অথচ যা কিছু সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা তারা অস্বীকার করে। —সূরা মুমতাহিনা ঃ ১

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ-

হে ঈমানদারগণ! নিজদের ব্যতীত অন্য লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।

—সূরা আল ইমরান ঃ ১১৮

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ -

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তাদের কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না যে, তারা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। তারা যদি তাদের পিতাও হয়, পুত্রও হয়, ভাই হয় অথবা তাদের বংশের লোক হয়, তবুও নয়।

—সূরা মুজাদালা ঃ ২২

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণ ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে পসন্দ করলে তাদের সাথে কোনরূপ ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখো না। —সূরা তাওবা ঃ ২৩

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا- لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ- وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ -

এদের বহু লোককে দেখছেন যে, কাফিরদের সাথে এরা বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। তাদের মন্দ কাজের ফলে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত

নাখোশ। তারা সর্বদাই শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকবে। এ অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা। এরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি, নবী (সা)-র প্রতি এবং তাঁর উপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখতো এবং ওদেরকে বন্ধু না বানাতো (তবে কতই না ভাল হতো)! কিন্তু এদের অধিকাংশই ফাসিক। —সূরা মায়িদা ঃ ৮০-৮১

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ - اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ- وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

যারা তোমাদের সাথে দীনের পথে অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দেয় না, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার ও ন্যায়-নীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় ইনসাফ প্রদর্শনকারীকে পসন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা তোমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে লড়াই করেছে এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কারকরণে সাহায্য-সহায়তা করেছে। যারা এদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই হচ্ছে জালিম। —সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮-৯

আল-কুরআনের এ সব স্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এসব বিধানের নাকের ডগায় চড়ে আমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দ ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকা, রাশিয়াসহ ইসলামের অন্যান্য শত্রুর সাথে দোস্তী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে চলছে। অথচ এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। মুসলমানদের শত্রুদেরকে সর্ববিধ সহায়তা দিচ্ছে এবং মুসলিম জনতার প্রতি সর্বপ্রকার জুলুম-অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাচ্ছে। আমাদের শাসকরা এদের তোষামোদের মধ্যেই প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুসন্ধান করছে। অথচ মুসলমানের বুকের তাজা রক্ত দ্বারাই তাদের হাত রঞ্জিত হচ্ছে।

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ

ইসলামের পথে বাধা

পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, আমাদের সামাজিক জীবন নানাবিধ কুসংস্কার, মতভেদ, দলাদলি, সংঘর্ষ ও ফিতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিপদ-আপদ এসে আমাদের সমাজের টুটি চেপে ধরছে। প্রত্যেকটি মুসলমানের এ কথা জানা আছে যে, আমাদের সকল রোগের চিকিৎসা এবং সমুদয় দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হবার একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। মুসলমান শুধু এ সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে না; বরং তারা তাদের সামাজিক জীবনে ইসলামী বিধান ও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দাবি পেশ করে থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে চলছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিকারী কোন বস্তু থেকে থাকলে এবং মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমান সংখ্যালঘু হলে বলা যেতে পারতো যে, অমুসলমানদের সংখ্যাধিক্য হচ্ছে এ ব্যবধান সৃষ্টির মূল কারণ। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে বুঝতে পারবেন যে, এ পথে বড় বাধা হচ্ছে মাত্র দু'টি। একটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ, আর অপরটি হচ্ছে মুসলমানদের নিজস্ব সরকার।

সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ হচ্ছে ইসলামের পয়লা নম্বর শত্রু। সে সর্বপ্রথম ইসলামী আইনকে বাতিল এবং তদস্থলে অনৈসলামিক আইন প্রবর্তনের পথ খুলে দিয়েছে। ইসলামী আইনের ভিত্তিতে যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ কখনো তার আদর্শ গেড়ে দিতে পারে না। তাকে অবশ্যই পালাবার পথ বেছে নিতে হয়। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ দেখতে চায়। সে সাম্রাজ্যবাদের বিলাসিতাকে কোন অবস্থায়ই বরদাশত করে না। ইসলাম কুফরের সম্মুখে কোন দিক দিয়ে মাথা অবনত করা বা তার দ্বারা দমিয়ে থাকাকে মুসলমানদের জন্য হারাম করে দিয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বদা মাথা উঁচু করে সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকতে শিক্ষা দিয়েছে

এবং তখন পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছে, যখন পর্যন্ত সমাজের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিজয় লাভ না করে। ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সম্পর্ক গড়াকে হারাম করে দিয়েছে এবং তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা অপরিহার্য করেছে। এখন আপনি নিজেই বিচার করুন যে, সাম্রাজ্যবাদ কিরূপে ইসলামী পরিবেশের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবার সুযোগ পেতে পারে। যেখানে সাম্রাজ্যবাদ শিকড় গেড়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় সেখানেই বা কিরূপে ইসলাম টিকে থাকতে পারে ?

ইসলাম পৃথিবীর সকল মুসলমানকে একজাতি নিরূপণ করে এবং তাদের কাছে তাদের শত্রুরা সম্মুখে সীসার প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হবার আহ্বান জানায়। ইসলামের শত্রুরা মুসলিম দেশগুলোর দু'একটিকে হয়তো তাদের শিকারে পরিণত করতে পারে। কিন্তু সমগ্র দুনিয়ার ইসলামী ঐক্য ও সংহতির মুকাবিলা করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব ? এ কারণেই তারা চায় যে, মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আইন প্রবর্তিত হবার পরিবর্তে পৃথক পৃথক জাতীয় অনৈসলামী আইন প্রবর্তিত হোক এবং একটি আন্তর্জাতিক জাতীয়তা সৃষ্টি হবার পরিবর্তে তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক স্বদেশী বংশীয় ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার প্রকাশ ঘটুক। ভূ-পৃষ্ঠের বুকে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ততদিন লড়াই চলতে থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে শক্তি বর্তমান থাকা পর্যন্ত তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। আর শক্তি না থাকলে তারা শক্তি সঞ্চয়ের সংগ্রাম করতে থাকবে। তারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধচুক্তি ও সন্ধি করতে পারে। কিন্তু যখনই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ হতে চুক্তিভঙ্গ ও অস্বীকারকরণের আভাস পাওয়া যাবে তখন তখনই তা তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলতে হবে এবং প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ইসলামে পুঁজিবাদী হওয়া, জোর জবরদস্তি খাজনা উশূল করা, অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করা এবং সুদের সমুদয় পন্থাই হারাম। এ সুদই হচ্ছে মূল স্তম্ভ, যার উপর সাম্রাজ্যবাদের ইমারত দণ্ডায়মান। এ স্তম্ভটিকে সরিয়ে ফেলা হলেই আপন হাতে সাম্রাজ্যবাদের সাধের মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এ কারণেই সাম্রাজ্যবাদ যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে মুসলিম দেশে প্রবেশ করার পথ পায়, তখনই তার সব প্রাথমিক কাজ হচ্ছে দেশের ইসলামী বিধান ও আইনকে অকর্মণ্য করে দিয়ে তা বাতিল করে দেওয়া। একটি পথ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রবেশ শুরু হলে অপর পথ দিয়ে ইসলামের বহিষ্কার হবার পালা শুরু হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র

সাম্রাজ্যবাদ তার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এবং মুসলমান ও ইসলামের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর অস্ত্র ও কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে মুসলমানদের কল্যাণকামী ও দরদী বন্ধু সেজে তাদেরকে ইসলামের বস্তাপচা পুরানো আইন পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের আধুনিক আইন গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। কেননা আধুনিক আইনই হচ্ছে শক্তি-ক্ষমতা, উন্নতি-প্রগতি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক ও নিশ্চয়তা দানকারী। অথচ এ আধুনিক আইনগুলোই হচ্ছে দুর্বলতা, স্থবিরতা, ব্যর্থতা, ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের জিহাদী চেতনা ও সংগ্রামী শক্তিকে সর্বদা ভীতির চোখে দেখে থাকে। এ কারণেই মুসলমানদের এ চেতনা ও শক্তি যাতে করে উজ্জীবিত না হয় বরং সর্বদা পিছপা হতে থাকে সে জন্য কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি তারা করে না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্লাডস্টোন-এর সেই কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যা তিনি মিসরের দারুল আওয়ামে দণ্ডায়মান হয়ে বক্তৃতায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পা তখন পর্যন্ত ইসলামী দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ তাদের মধ্যে সেই কিতাবটি বর্তমান থাকবে যেটিকে তাদের ভাষায় কুরআন বলা হয়।"

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, তাদের প্রচারকবৃন্দ ও মিসনারীগুলো থেকেও এ ব্যাপারে সাহায্য-সহায়তা নিয়ে থাকে। যেহেতু তারা পরিষ্কাররূপে এ কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, প্রকাশ্য ও সরাসরিভাবে মুসলমানদেরকে কাফির বানানো এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ জন্য বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাদের মহান সম্মানিত আসনটি হতে ধাপে ধাপে নিম্নগামী করার চেষ্টা করে চলছে। পাশ্চাত্যের প্রচারকবৃন্দ আমাদেরকে বলে বেড়ায় যে, ধর্ম এবং জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা এ কথাও বলে যে, খৃস্টান গির্জাগুলোর ইতিহাস সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, যখন পর্যন্ত এ দু'টির কর্ম-সীমাকে পৃথক না করা হয়েছে, ইউরোপীয় জাতিগুলো তখন পর্যন্ত উন্নতি ও প্রগতির মসনদে সমাসীন হতে পারে নি। তারা মুসলমানদেরকে এই বলে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে যে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অবনতির মূল কারণ হচ্ছে ধর্মের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক ও প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা এবং জীবনের সর্বব্যাপারে ধর্ম থেকে পথের দিশা গ্রহণ করা। তাদের কথামতে যখন পর্যন্ত ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর পৃথক করা না হবে

এবং ইউরোপীয়দের ন্যায় ধর্মহীন ও ধর্ম বিবর্জিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হবে, তখন পর্যন্ত মুসলমানরা উন্নতির মুখ দর্শন করতে পারবে না! পাশ্চাত্যের এ সব প্রচারক ও চিন্তাবিদদের এ যাদুমন্ত্র মুসলিম সমাজে বেশ কার্যকরী হচ্ছে। আমাদের বহু লেখক ও রাজনীতিবিদও এই সুরে সুর মিলানো শুরু করে দিয়েছে। তারা মুসলমানদের মন ও মানসিকতাকে বিকল করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও মিশনারীদের জন্য অনেকখানি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে নামসর্বস্ব এমন সব বহু মুসলমান রয়েছে যাদের মন-মস্তিষ্ক, কলম ও মুখকে তারা অতি নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছে। তাদের দ্বারা ধর্মের বিরোধিতা করানো হচ্ছে এবং তাদের দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে এই কথা প্রচার করানো হচ্ছে যে, তারা সমুদয় পার্থিব ব্যাপারে ও বিষয়াবলী হতে ধর্মকে উৎখাত করে দেবে এবং ইউরোপীয়দের ন্যায় ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এই পথেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের হস্তক্ষেপকে সুদৃঢ় করে থাকে।

এহেন ষড়যন্ত্রের ফলেই আজ আমরা দেখছি যে, আমাদের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্ম শিক্ষার আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত কারিকুলামই পাশ্চাত্যের থেকে ধার করে আনা হয়েছে। যারা এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে শিক্ষা নিয়ে বের হয়, তাদের অবস্থা হচ্ছে তারা রাষ্ট্র ও রাজনীতির ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ ও কার্যকরী ভূমিকা পালনের আদৌ যোগ্য মনে করে না। তাদের ধারণামতে পার্থিব কোন ব্যাপারেই ধর্মের নাক গলানো উচিত নয়। তাদের শুধু আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তারা মনে করে যে, ধর্মীয় বিধান হতে পরিত্রাণ না পাওয়া ব্যতিরেকে কোন জাতিই উন্নতির স্তরসমূহ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সোপানগুলি অতিক্রমই করতে পারে না। এরা ধর্মীয় জ্ঞানের বেলায় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলেও ধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রকাশের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনে পিছ পা থাকে না। দুঃখ হচ্ছে যে, মুসলমানদের রাষ্ট্রগুলো এবং তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি এমন সব লোকের হাতেই রয়েছে। এ সব অন্তসারশূন্য নিছক বস্তুবাদী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রগুলো হতে এমন ইবরাহীমী প্রকৃতির লোক বের হতে পারে, যারা স্বীয় চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের প্রতি সমালোচনা অনুসন্ধিৎসু ও তুলনামূলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে এবং সাম্রাজ্যবাদ কিরূপে তার সাফাইর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ও কিরূপে তাদের নিজেদের হাতের অস্ত্রে পরিণত করছে সে তত্ত্ব উপলব্ধি করতে কি সক্ষম হবে?

ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকতা

মুসলমানরা যদি মনে করে যে, ইউরোপীয়দের উন্নতি ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকতার মধ্যেই নিহিত, তবে এটা তাঁদের সরলতা ও অজ্ঞানতারই বিরাট সাক্ষ্য। আসল তত্ত্ব হচ্ছে যে, ইউরোপীয়রা যে খৃস্টধর্মের সাথে পরিচিত ছিল তাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিষয় সম্পর্কীয় কোন বিধান ও নীতিমালা আদৌ ছিল না; যা রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক জুড়ে দিতে পারে। রোমান সাম্রাজ্য যখন খৃস্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েছিল এবং তাকে সরকারী ধর্ম নিরূপণ করে তার প্রচারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে বহন করেছিল, খৃস্টধর্ম তখনই উন্নতির উচ্চ শিখরে আসন নিতে সমর্থ হয়েছিল। এ সময় এ সাম্রাজ্যের এমন একটি নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ আইন ছিল, যাকে আজ পর্যন্ত 'রোমান ল' নামে অভিহিত করা হয়। খৃস্টধর্মকে সরকারী ধর্ম নিরূপণ করার পূর্বে এবং পরে এ সাম্রাজ্যের আইন ছিল এ রোমান আইনই। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র যখন নিজেরা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলো, তখন এ 'রোমান ল'-ই তাদের আইনের উৎস ছিল। এদিক দিয়ে পরিষ্কার জানা যায় যে খৃস্টধর্মের কাছে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার যেমন কোন আইনগত নীতিমালা বর্তমান ছিল না তেমনি রাষ্ট্রের আইনের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ করারও কোন সুযোগ সে পায়নি। অবশ্য খৃস্টধর্ম সরকারী ধর্ম হয়ে যাবার পর তার কোন কোন নৈতিক নীতিমালার প্রভাব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পড়েছিল। কিন্তু এর পর এমন এক দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, গির্জার পীর-পুরোহিতগণ রাষ্ট্রনায়কদের সাথে একটি গোপন ষড়যন্ত্র করে গির্জার প্রভুর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে গদীনশীন হয়ে পড়লো। ধর্মে কোন বিধান তো আদৌ ছিলই না। তারা নিজেদের জ্ঞান ও বিবেকের উপর নির্ভর করেই নয়, বরং নফসের উপর ভিত্তি করে কিছু নীতি ও নিয়ম-কানূন বানিয়ে নিয়ে তা দ্বারা ধর্ম ও আল্লাহ্‌র নামে জনগণের মাথা মুড়ানো শুরু করে দিল। উদ্দেশ্য হলো' জনতাকে নিজেদের ইচ্ছার গোলাম বানিয়ে রাখা। কিছুদিন পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান থাকার পর পরবর্তীকালে দর্শন চিন্তাধারা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব ধর্মীয় ইজারাদারদের বিরোধী শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেল। ক্ষমতা অর্জনের জন্য উভয় গ্রুপের মধ্যে কঠোর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে পরিশেষে গির্জার প্রভুরা পরাজয় বরণ করলো এবং তাদের বিরোধীরা রাজনীতি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হলো।

এ সংঘর্ষ মূলত ধর্ম ও নাস্তিকতার কোন যুদ্ধ ছিল না। আর রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না—এ নীতিও সংঘর্ষের মূল

কারণ ছিল না। আসলে নিছক স্বার্থকে ভিত্তি করে ক্ষমতার আসনে সমাসীন হবার জন্যই এ লড়াই হয়েছিল। দীন-ধর্মের সাথে এ লড়াইর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। একদিকে গির্জার ঠিকাদার প্রভুরা ধর্মের নামে জনতাকে প্রতারিত করে যাচ্ছিল, অপরদিকে সাধারণ রাজনীতিবিদরা জনসাধারণ ও গণতন্ত্রের নামে নিজেদের প্রভাব খাটাতে চেয়েছিল। এ যুদ্ধটি কোন আদর্শগত যুদ্ধ ছিল না। বরং স্বার্থের খাতিরে আদর্শহীনভাবেই এ লড়াই হয়েছিল। ধর্মের সাথে রাষ্ট্র ও আইনের যত কিছু সম্পর্ক ও পার্থক্য প্রথমে ছিল তা কম-বেশি এখনো বর্তমান রয়েছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর ইউরোপীয় আইনের পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, এর ভেতর মৌলিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তনই সাধিত হয়নি। শুধু এতটুকু পরিবর্তন দেখা যায় যে, প্রথমত শাসন গির্জার চার্চদের নামে পরিচালিত হচ্ছে। নতুবা অবস্থা এই চলেছে যে প্রথমত গোটা কয়েক লোক নিজেদের ধারণা ও খেয়াল-খুশি মত আইন প্রণয়ন করতো। আর এখন কিছুলোক নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশি মাফিক আইন প্রণয়ন করে চলছে। আইনের ভিত্তি সেই 'রোমান-ল'-ই রয়ে গেছে। বিভিন্ন যুগ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু অপরিহার্য ততটুকুই বিবর্তন এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, গির্জার যাজক ও তার বিরোধীদের সংঘর্ষ থেকে দু'ধরনের ফলোদয় হয়েছে। প্রথমত বিশেষ কোন গ্রুপের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধর্মীয় সাহায্য লাভের অবকাশ রইলো না এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর ধর্মের নামে সর্বদা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করারও সুযোগ রাইলো না। দ্বিতীয়ত, মতাদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা সকলে পেয়ে গেলো। গির্জার প্রভুরা জনসাধারণকে বিশেষ একটি আকীদা-বিশ্বাস মানতে বাধ্য করতো এবং যারা মানতো না তাদেরকে নানাবিধ শাস্তি দিত। এ দু'ধরনের ফল তার স্থানে খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল। এর উভয়কে অথবা কোন একটিকে লাভ করার অর্থ এ নয় যে, এখন থেকে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট নেই অথবা এ সম্পর্ককে এখন ছিন্ন করা উচিত। আর ধর্মকে আইনের উৎসমূল ও ভিত্তিরূপে পরিগণিত করার অর্থ কখনোই এ নয় যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের উপর বিশেষ একটি শ্রেণীর ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা জনসাধারাণকে কোন আকীদা-বিশ্বাস মানতে বা তার অনুসারী হতে বাধ্য করা হবে। ইসলামে এহেন অবস্থা সৃষ্টি হবার কোনই অবকাশ নেই। ইসলামে আলিম-উলামা ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের কোন বংশগত বা পেশাগত শ্রেণী নেই। প্রত্যেকটি মুসলমানই আলিম ও ফকীহ হতে পারে। আর ইসলামের দাবিও এটাই যে, তারা ইসলামের আলিম ও ফকীহ হয়ে থাকুক, অজ্ঞতার তিমিরে না থাকুক। ইসলামী আইন ও

বিধান অনুসারে আলিম-উলামা ও আইনবিদগণের এমন কোন জন্মগত অধিকার সংরক্ষিত নেই, যা থেকে অন্যান্য মুসলমানকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামে আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষকে জোর-জবরদস্তি করে কোন আকীদা-বিশ্বাস মানতে বাধ্য করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল-কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছে "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। মহানবী (স) বলেছেন ঃ

امرنا بتركهم وما يدينون –

অর্থাৎ মানুষকে তার জীবনাদর্শ ও মতবাদের উপর চলার জন্য ছেড়ে দিতে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম দেশ ও ইউরোপীয় দেশ

মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে ভিন্ন। আমাদের ধর্ম খৃস্টধর্মের ন্যায় নয়। আমাদের ধর্মে যেরূপ জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার বিধান বর্তমান রয়েছে, তেমনি রাজনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কেও পরিষ্কার বিধান বর্তমান আছে। এ কারণেই ধর্মের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হলে শাসক ও উলামাবৃন্দের মনগড়া আইন আল্লাহ ও ধর্মের নামে চালাবার আদৌ কোন অবকাশই থাকে না। ইসলামী আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোর কার্যক্রম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের কাছে রয়েছে। সেখানের ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবার ইতিহাসও রয়েছে। কিন্তু সে বিচ্যুতিকে সর্বদা বিচ্যুতিই মনে করা হয়েছে। তাকে ধর্মের পক্ষ হতে কখনো সাফাই দিয়ে সঠিক বলা হয়নি। আর এটাও অবিসংবাদিত সত্য যে, ইসলামে রাজনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কীয় যেসব বিধান ও হিদায়ত রয়েছে, তা ইসলামী আদর্শ শিক্ষাবলীর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ! এগুলোকে পরিত্যাগ করে তদস্থলে অনৈসলামী আইন-কানূন প্রচলিত করা হলে তা ইসলাম হতে বহিষ্কার হওয়া এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। খৃস্টানরা যখন ধর্ম হতে রাজনীতিকে পৃথক করার কথা ঘোষণা করলো তখন বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের আইন-কানূন পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন পড়লো না। কারণ খৃস্টধর্মে এ সব আইন-কানূন কোন সময়েই ছিল না এবং রোমান আইন প্রথম হতেই সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। যা হোক, এ ব্যাপারে ইসলামকে খৃস্ট ধর্মের সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। আর

এ দিক দিয়ে মুসলমানদের ইতিহাস ও ইউরোপীয়দের ইতিহাসে কোনরূপ সাম স্য ও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ধর্ম অবনতির কারণ নয়

সাম্রাজ্যবাদ পূজারী ও তাদের শিষ্য-শাগরিদবৃন্দ মুসলিম দেশগুলোতে এ কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, মুসলমানদের অবনতি ও দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীলতা। কিন্তু পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ এখন পর্যন্ত ধর্মের অনুসারী। ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের জনসাধারণ কোটি কোটি পাউণ্ড এখনো খৃস্টধর্ম প্রচারের কাজে ব্যয় করে চলছে। ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া যদি অবনতির কারণ হয়, তবে এ দেশগুলো তাদের ধর্মকে কেন বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে না এবং অন্যান্য দেশে তার প্রচার কাজ হতে কেন বিরত থাকছে না ? অন্য কোন ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীলতা অবনতির কারণ হোক বা না হোক, ইসলামের প্রতি আনুগত্য মানুষকে উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় নিয়ে উপনীত করে। শক্তি ক্ষমতা, ইযযত-সম্মান, প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের উপায়-উপকরণাবলী সংগ্রহ করা ইসলাম মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করে। ইসলাম মুসলমানদের কল্যাণের আহ্বায়ক হতে এবং কল্যাণকর সকল কাজে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেয়; সমুদয় মানবিক ভ্রাতৃত্বকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভয়-ভীতি, দুর্বলতা, অজ্ঞানতা, ও দারিদ্র্য দূরীকরণকে মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে। মুসলমানদের কাজ হচ্ছে তারা এ দুনিয়া হতে জুলুম-অত্যাচার-অবিচার, অবৈধ পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ ও অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারকে চিরতরে মিটিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা যে রূপরেখায় ইসলামী জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন তাকে সেই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীন রূপরেখায় প্রতিষ্ঠিত করা হলে সমগ্র মানবতার সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে এবং দুনিয়ার সকল বিপদ-আপদ সহজ হয়ে যাবে।

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদের সংমিশ্রণ

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে একে অপরের প্রাণের শত্রু। সুতরাং অবস্থা এমন যে সাম্রাজ্যবাদ ইসলামকে এত ভয় করে যে, ইসলামের আগমনের কথা ভাবতেই তার মন চঞ্চল হয়ে উঠে, রাতের নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল দেখে তার মন একটুও প্রকম্পিত হয় না। অথচ একটি ছোট ইসলামী দল দেখলেই সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

পড়ে, তার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদ এ কথা ভাল করেই জ্ঞাত আছে যে, সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলো জাগতিক ও বস্তুগত স্বার্থের অভিলাষী। এ কারণে তাদেরকে সম্মত ও সন্তুষ্ট করানো কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আসল মুসলমানেরা তো সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তার পথে শাহাদত লাভের আকাঙক্ষায় থাকে। এমন মুসলমানদেরকে তাদের বাঞ্ছিত বস্তু থেকে অমনোযোগী করা এবং নিকৃষ্ট জাগতিক সম্পদ দ্বারা তুষ্টকরণ সহজ কাজ নয়। মুসলিম দেশগুলোতে যখন জিহাদ, লড়াই ও শাহাদাতের চেতনা-অনুভূতি উজ্জীবিত হয়ে উঠে তখন পাশ্চাত্য শক্তিগুলো মুসলিম শাসকদেরকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ্র পথের আহবায়কদের উপর নানাবিধ জুলুম-অত্যাচার করতে ও আল্লাহ্র পথের অগ্রাভিযান হতে বিরত রাখার চেষ্টা চালিয়ে থাকে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান তাদেরকে বিরত রাখতে পারে না, তারা সরকারের চোখ রাঙ্গানীকে ভয় করে না এবং হাতিয়ার ফেলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আর শত্রু-মিত্রের দু'মুখী লড়াইয়ের সময় আল্লাহ্র দরবারে ধৈর্য অবলম্বন ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তারা প্রার্থনা করে। এর ফলে সাধারণ ঘুমন্ত মুসলমানদেরও চোখ খুলে যায়। মুসলমান ও ইসলামের শত্রু কারা, তা তারা চিনে নিতে পারে। তাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও বাস্তব সাহায্য পরিশেষে তারাই লাভ করে, যাদের লড়াই ও মৃত্যু একমাত্র ইসলামের জন্যই হয়।

সর্বশেষ সংগ্রাম

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এখন এক নয়া পর্যায়ে এবং অত্যন্ত দুর্বলতম দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি এক নবতর সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নিয়ে দুনিয়ায় তার মরণ-থাবা বিস্তার করছে। সে সাম্রাজ্যবাদ হলো রাশিয়ার নাস্তিকতবাদী সাম্রাজ্যবাদ। এ তার মারমুখী ভয়াল রূপ নিয়ে ইসলামী দেশগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ পুরানো সাম্রাজ্যবাদ ভাল করে জ্ঞাত আছে যে, এই ইয়াজুজ-মাজুজকে বাধা প্রদানের জন্য কোন বস্তু যদি সেকেন্দারী প্রাচীরের ভূমিকা পালন করতে পারে তা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। পুরানো সাম্রাজ্যবাদ এখন দু'টি মহাবিপদের মধ্যে নিপতিত। রাশিয়ার জন্য ময়দান ছেড়ে দিলে সমাজতন্ত্রের দানব যে সকলকে পায়ে পিষে মেরে ফেলবে সে বিশ্বাস তার অবশ্যই আছে। পুরানো সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষ মন্দিরটিও সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করতে একটুও কসুর করবে না। যদিও পুরানো সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের

আগমনকে বাধা দেয় না, তথাপি ইসলাম এ পুরানো সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নকে মুসলিম দেশ হতে মুছে ফেলতে একটুও দ্বিধা করবে না। পুরানো সাম্রাজ্যবাদ এখন মুসলমানদেরকে ভাড়াটিয়া সৈন্য বানিয়ে তার পতাকাতলে জমায়েত করে রাশিয়ান নাস্তিকতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দোহাই দিয়ে তাদেরকে নিজের পক্ষে ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এটা নিছক স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। ইনশাআল্লাহ! এদের স্বপ্ন সফল হতে পারবে না।*

ইসলাম পুরানো সাম্রাজ্যবাদ ও নতুন সাম্রাজ্যবাদ-উভয়কে একই দৃষ্টিতে অবলোকন করে এবং উভয়ের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা-বিদ্বেষও পোষণ করে। এ কারণেই এরা উভয়ই ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আসছে। শুধু মুসলিম দেশগুলোর উপর প্রভুত্ব করার জন্য এবং সেখানে একে অপরকে হটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পরস্পর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এক শত্রুর সহায়তা করে দ্বিতীয় শত্রুর বিরোধিতা করায় মুসলমানদের কি স্বার্থ থাকতে পারে ? অবশ্য নিরপেক্ষ দল হিসাবে অপেক্ষায় থাকার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। একান্ত লড়তে হলে তা যেন নিজেদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্যই হয়। এ্যাঙ্গলো–আমেরিকান ও রাশিয়ান শিবিরের এহেন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দ্বারা আসলে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের এ দু'টি শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার সুযোগ এনে দিয়েছেন। মূলত এটা দু'টি-চোরের এমন প্রাকৃতিক লড়াই, যে আমাদের ঘরে চুরি করার জন্য সিঁদ কাটা নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষ করছে। আমরা এদেরকে ঘরে চুরি করার জন্য পথ পরিষ্কার করে দিতে চাইলে আমাদের উচিত একটি চোরের বিরোধিতায় অপর চোরের সহায়তা করা। আর আমরা আমাদের ঘরকে নিরাপদ রাখতে চাইলে চুপ করে খুব বিচক্ষণতার সাথে এ সংঘর্ষের পরিণামের জন্য অপেক্ষা করা উচিত এবং যে গ্রুপই আমাদের পানে আসবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। একজন খাঁটি মুসলমানের কখনোই সাম্রাজ্যবাদীদের জালে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। যখন পর্যন্ত তারা মুসলিম দেশগুলোর উপর জুলুম-অত্যাচার করা হতে বিরত না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের উপর আস্থাশীল হওয়া আদৌ ঠিক নয়। ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ এখন পর্যন্ত সংগ্রামের ময়দানে রয়েছে। সর্বশেষ সংগ্রামের সময় এসে উপনীত হয়েছে। দুনিয়ার সকল মুসলমানের সেই ওয়াদাকৃত দিনটির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। ইনশাআল্লাহ মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র মদদ ও নুসরত দ্বারা সাফল্যের বিজয় মুকুট পরিধান করতে পারবে। পুঁজিবাদ ও বলশেভিক

---

* এসব তৎকালীন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই লেখক রচনা করেছিলেন। অবশ্য পরে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

বিপ্লববাদীরা অতি সত্বরই দেখতে পারবে যে, বিজয়ের শিরোপা কাদের শিরে শোভা পায়।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের চরিত্র

মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলো কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং ইসলামের পথে আত্মবিসর্জনকারী মুজাহিদের প্রতি কিরূপ জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে সে বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এ সব সরকার কিরূপে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম নিরূপণ করছে এবং ইসলামী আইনগুলোকে অকেজো করে আল্লাহ্‌র অঙ্কিত সীমারেখাকে পয়মাল করে দিচ্ছে, তা আমরা জ্ঞাত হয়েছি। আমরা এ কথাও ইতিপূর্বে লিখেছি যে, এ সরকারগুলোর সমগ্র কর্মতৎপরতা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকূলে এবং সাধারণ মুসলমানদের বিরোধিতার ভূমিকায় নিয়োজিত। এ ব্যাপারে আমরা বহু উদাহরণই পেশ করতে পারি, যার দ্বারা এ সরকারগুলোর ইসলামের দাবির অন্তঃসারশূন্যতা পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ পায়। আর তাদের সমুদয় কর্ম তৎপরতা যে ইসলামের স্বার্থের বিরোধী তা-ও বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি এখানে এ আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তবে এ সকরকারগুলোর এ চরিত্র গ্রহণ করার মূল কারণটি কি তা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। এ কর্ম-চরিত্র গ্রহণ করার মূলত প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে ইসলামী বিধান সম্পর্কে এদের জ্ঞান না থাকা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমতা হারাবার ভয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক কথা যে, মুসলিম দেশগুলোর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব এমন লোকদের হাতে রয়েছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর তারাই হচ্ছে জাতীয় গাড়ীর পরিচালক। আন্তর্জাতিক বৈঠক, সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে তারাই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এদের মধ্যে এমন শাসকও রয়েছেন যাদের পিতামাতা ও বংশাবলীর লোকজনের জীবন ইসলামী জ্ঞান ও কর্মের নূরানী আভায় সমুজ্জ্বল। এরা বর্তমানেও নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মভীরু। কিন্তু এদের ইসলাম গুটিকয়েক গতানুগতিক ইবাদত ও অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা একজন সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানের তুলনায় ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু জ্ঞান রাখে না। এরা শুধু নামায, রোযা ও হজ্জকে ইসলাম মনে করে। ইসলাম যে দুনিয়া- আখিরাতের সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং মসজিদ হতে শুরু করে রাষ্ট্রের শাসক পর্যন্ত আমাদের সকলকে প্রতিটি কদমে কদমে পথ প্রদর্শন করে, এ সত্য সম্পর্কে তারা আদৌ কোন খবরই রাখে না। তারা

এতটুকুও অবহিত নয় যে, ইসলামী বিধানের সর্বপ্রাথমিক নীতি হচ্ছে মুসলামনগণ আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সমুদয় তালীম ও হিদায়তের উপর ঈমান ও আস্থা পোষণ করবে। ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বিশ্বাসের নামই নয় বরং কর্ম হচ্ছে তার অপরিহার্য দাবি। মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষার নামই ঈমান নয়। বরং অন্তঃপুরের গহীন কোঠায় গিয়ে যা প্রবেশ করে এবং যা কর্ম প্রমাণিত করে দেয়, তার নাম হচ্ছে ঈমান। কিছু লোক এ জগত ছেড়ে এমনভাবে চলে যাবে যে, তাদের কোন পুণ্যই নেই। তারা বলবে আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি সৎ ধারণা পোষণ করতাম। কিন্তু তারা কর্মে মিথ্যাবাদী। তারা বাস্তবিকই সৎ ধারণা পোষণ করলে কাজও ভাল করতো।

প্রত্যেকটি লোকের কাছেই তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারা কাজ ভাল করলে তাদেরই কল্যাণ হবে। আর কাজ খারাপ করলে তাদেরই মন্দ হবে। কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ –

হে নবী! আপনি সকলকে কাজ করতে বলুন। কারণ অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কাজ দেখবেন। —সূরা তাওবা ঃ ১০৫

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ– عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

অতএব তোমার প্রভুর শপথ। আমি তাদের সকলের কাছে তাদের কাজ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো। —সূরা হিজর ঃ ৯২-৯৩

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ–

আর এই যে জান্নাত; তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকার করা হয়েছে তা একমাত্র তোমাদের ঈমানের দাবি মাফিক কাজ করার বিনিময়েই।

—সূরা যুখরুফ ঃ ৭২

শাসকদের অজ্ঞানতা

আল্লাহ তা'আলা যে আমাদের উপর ইসলামের আইন-কানূন মেনে চলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং অন্য কারোর আইন-কানূন না মানার নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমাদের শাসকবৃন্দ আদৌ কোন খবরই রাখেন না। আমাদের রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানের উপর হওয়া উচিত এবং যাঁরা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান মাফিক রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা

ফাসিকী ও কুফরীর মধ্যে নিপতিত হয় এ কথাও তাদের জানা নেই। একজন মুসলমানের জীবনের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল আদর্শিক জীবন যাপন করা। আল্লাহ্‌র বিধানকে কোনক্রমেই বিভক্ত করা যেতে পারে না। একটি পরিত্যাগ করে অপরটিকে বেছে নেওয়ার অনুমতি আমাদের দেওয়া হয়নি। আল-কুরআন ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ- فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ -

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখো এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করো ? তোমাদের মধ্যে এমন যারা করে এ তাদের এ শাস্তি ছাড়া কিছুই নেই যে, তারা এ জগতে অপমানজনক ও যিল্লতীর জীবন যাপন করবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে। —সূরা বাকারা ঃ ৮৫

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ -

আপনি ওদেরকে পরিত্যাগ করে চলুন। ওরা আপনাকে বিপদের মধ্যে ফেলে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানের কিছু অংশ থেকে আপনাকে ফিরিয়ে রাখবে। —সূরা মায়িদা ঃ ৪৯

আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠা করাই যে সরকারের মুখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য—এ বিষয়টির সাধারণ অনুভূতিও এ শাসকদের নেই। দীনের মধ্যে ইবাদত, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, চরিত্র সংশোধন-নীতি সবকিছুই শামিল। ইসলামের দাবির প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচার এবং আল্লাহ্‌র অংকিত সীমারেখা কায়েম রাখা সরকারের দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত কাজ। তারা ইসলামের পরিপন্থী আইন-কানূন প্রয়োগ করে এমন একটি মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিচ্ছে যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা যে দেন নি সে কথাও তাদের জানা নেই। তারা মানুষকে তাগূতী শক্তির (আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির) আনুগত্য করার জন্য বাধ্য করছে। এদের অবস্থা হচ্ছে সেই লোকদের ন্যায়,যাদের কথা আল-কুরআন নিম্নরূপে বর্ণনা দিচ্ছে ঃ

واذا دعوا الى الله ورسوله - ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون -

ওদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য যখন ওদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের পানে ডাকা হয়, তখন ওদের মধ্যের একটি দল পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। —সূরা নূর ঃ ৪৮

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا - فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ - بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا - أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ - فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا -

আর যখন ওদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান এবং তার রাসূলের কাছে এস, তখন মুনাফিকদেরকে দেখা যায় তারা আপনার কাছে আসার পথে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যখন এ মুনাফিকরা নিজেদের কৃতকার্যের দরুন বিপদের মধ্যে নিপতিত হয় তখন এরা তোমাদের কাছে কসম করে বলে যে আমরা তো শুধু সন্ধি ও সমঝোতার প্রত্যাশী। এদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত। সুতরাং এদের থেকে ফিরে থাকুন এবং এদেরকে নসীহত করুন। আর এদেরকে পরিষ্কারভাবে বলুন যেন ওদের অন্তরে গিয়ে ধাক্কা লাগে। —সূরা আন-নিসা ঃ ৬১-৬২

এ শাসকবৃন্দ ভাল করেই অবহিত যে, বর্তমান যুগের আধুনিক আইনগুলো মানবিক প্রবৃত্তি এবং শাসনকর্তাদের চিন্তার ফসল ছাড়া কিছুই নয়। অথচ তারা কি একথা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা এহেন প্রবৃত্তি ও চিন্তাধারার পায়রবী করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন ? তারা মনে করে যে, এ সব আইন-কানূনই পাশ্চাত্য জগতকে উন্নতির উচ্চ সোপানে পৌছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এর কোন ভিত্তি নেই। মুসলমানরা যখন ইউরোপীয়দের দেশ দখল করে নিয়েছিল এবং ক্রুশ যুদ্ধবাদীদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, ইউরোপীয়দের কাছে যখন একমাত্র মুসলমানদের মুদ্রাই প্রচলিত ছিল, এ সময় কি ইউরোপে এ আইন-কানূন প্রচলিত ছিল ? দুনিয়ার

মানুষ মুসলমানদের সাথে মতবিরোধ পোষণ করুক বা তাদের বিরোধিতা করুক না কেন, মুসলমানরা আদৌ তা পরোয়াই করে না। সংখ্যাধিক্যের আনুগত্যের নাম সত্য নয়। আল্লাহ এবং তার রাসূলের রচিত পথে চলার নামই হচ্ছে সত্য। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا –

এদের অধিকাংশ ধারণার আনুগত্য ছাড়া কিছুই করছে না।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ –

আপনি দুনিয়ার সংখ্যাধিক্যের পায়রবী করলে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। —সূরা আন'আম ঃ ১১৬

মু'মিনগণ হচ্ছে আল্লাহ্র বান্দা, তারা কখনো আল্লাহ্র পথ হতে সরে থাকতে পারে না। তারা প্রবৃত্তির গোলাম নয়। মানুষকে নয় বরং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের শাসকবৃন্দ কিরূপে এ আশা করতে পারে যে, মুসলমানরা আল্লাহ্র নাফরমানী করে তাদেরকে মেনে চলবে ? কুফরী ও তাগূতী শক্তির আনুগত্য করা তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেওয়া অপরিহার্য করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ –

হে ঈমানারগণ! যখন আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে জীবন দানকারী বিষয়ের পানে আহ্বান জানান, তোমরা সে আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দাও। —সূরা আনফাল ঃ ২৪

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا –

মু'মিনদের অবস্থা হলো, যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পানে ডাকা হয়, তখন তাদের জবাব হচ্ছে আমরা শুনেছি এবং আমরা মেনে নিয়েছি। —সূরা নূর ঃ ৫১

এই হচ্ছে আমাদের শাসকবৃন্দের চরিত্র আর এই হচ্ছে ইসলামের বিধান। তারা এ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে এ অজ্ঞতার পরিণাম মুসলমানদের ধ্বংস এবং খোদ তাদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়। তারা জেনেও অজানার ভান করলে এবং ইসলামী বিধানকে অস্বীকার করলে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যে অঙ্গীকার রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তারা সেই অঙ্গীকারই ভঙ্গ করছে। এরা আল্লাহ্‌র যমীনে ফিতনা-ফাসাদ ও হানাহানির বীজ বপন করছে। এরা আল্লাহ্‌র অনুগত দাস হতে এবং তাঁর ইবাদত করতে অস্বীকার করছে। শাসকের সিংহাসনে বসে এরা নিজদের প্রভুত্বের ও সার্বভৌমত্বের ডঙ্কা বাজাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমি এ সব আল্লাহদ্রোহী শাসকদেরকে আল্লাহ্‌র অর্ডিন্যান্স শুনিয়ে দিচ্ছি ঃ

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ –

যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার দৃঢ় করে নেওয়ার পর ছিন্ন করে ফেলে এবং যা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য হুকুম করা হয়েছে তা তারা ভঙ্গ করে, আর যমীনের বুকে মারামারি ও হানাহানি সৃষ্টি করে তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। —সূরা রা'দ ঃ ২৫

وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا –

যারা তাঁর ইবাদত করাকে লজ্জাকর মনে করে এবং নিজদেরকে সর্বময় কর্তা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ভাবে, এদের সকলকেই তিনি তাঁর কাছে জমায়েত করবেন। —সূরা আন-নিসা ঃ ১৭২

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا –

আর যারা তাঁর ইবাদত করাকে লজ্জাজনক কাজ মনে করে এবং সর্বময় কর্তা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিককে মোখতার হয় তাদেরকে কঠোর কষ্টদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকেই বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। —সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৩

ক্ষমতার লিপ্সা

এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে, মুসলিম দেশগুলোতে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রটির উপর ক্ষমতাসীন হবার লিপ্সা এবং সে ক্ষমতা হারাবার ভয় অত্যন্ত প্রবলভাবে বিরাজমান। তারা এ ক্ষমতার আসনে চিরস্থায়ীভাবে নিজদের নামটি খোদিত করে নেওয়ার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। এ জন্য তারা যে কোন ধরনের বিরাট ত্যাগ ও কুরবানী দিতে পিছ পা থাকে না। তারা নিজদের এবং দেশ ও দেশবাসীর মান-ইযযতকে ক্ষমতার জন্য বলি দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এরা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর দীনের দুশমনদের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত নিজেদের ধর্মকে বিসর্জন দেয়। সন্তুষ্টচিত্তে ও সোৎসাহেই ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রচনা করে। এরা এ সব অভিনব তৎপরতা শুধু নিজেদের গদি রক্ষার জন্য এবং ক্ষমতার কিশতী রক্ষা করার জন্যই করে থাকে। এরা ইংরেজ, রুশ, ফরাসী ও আমেরিকানদের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্য করে যাচ্ছে এবং মুসলিম নর-নারীদের জান-মাল ও ইযযত-আবরু নিয়ে খেলা করছে। অথচ আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করলে তারা তোমাদেরকে ইসলামের পথ থেকে ফিরিয়ে নেবে। অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। বরং আল্লাহই তোমাদের বন্ধু এবং তিনিই তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী। -সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ -

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন একটি দলের কথা মেনে চলো তবে তারা তোমাদের ঈমানদার হবার পর কাফির বানিয়ে দেবে। —সূরা আল ইমরান ঃ ১০০

এ ক্ষমতাসীন শাসকবৃন্দ এ কথা কি জানে না যে, বর্তমানেও বহু আহলে কিতাব মুসলামনদেরকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যেই তাদের কল্যাণকামী হচ্ছে ও

নানাবিধ কল্যাণ করে যাচ্ছে। এ শাসকবৃন্দ ইসলামের নিঃস্বার্থ সেবক ও খাদিমদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছে না; তাদেরকে সাহস যোগাচ্ছে না। কারণ এ সব শাসক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন করতে ইচ্ছুক নয়। বরং গায়রুল্লাহ তথা শয়তানের রঙে রঙিন করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এদেরকে কেউ কট্টর মুসলমান ও ধর্ম বলে আখ্যায়িত না করুক এ জন্য তারা কোন প্রচেষ্টাকেই হাতছাড়া করছে না। সুতরাং এ ভয়ের কারণেই তারা ইসলামের মূলদেশে আঘাত হানার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ ইসলামই যে তাদের মান-ইযযত ও শক্তি-ক্ষমতার একমাত্র সাবলীল উৎস, সে কথা জেনেও বেমালুম ভুলে যায়। এরা ইসলামের মূলতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারতো যে, ইসলামের সাথে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং কুফরের সাথে শত্রুতাই হচ্ছে মুসলিম জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে নিজেরা নিজেদের জীবনকে এবং নিজ চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশকে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন করে তোলা। কালামে পাকে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً –

আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হও। আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম লোক কে থাকতে পারে ?

দুঃখের কথা যে, ক্ষমতার লিপ্সা ও গদির লোভই ক্ষমতালিপ্সু বুভুক্ষুদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছে এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই ইসলামের পথে বাধার জগদ্দল পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুনিয়ার সমগ্র মুসলমানকে এমন সব শাসকগোষ্ঠী ঘিরে রেখে দিয়েছে, যাদের মূল লক্ষ্য ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা নয় বরং নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ীকরণই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। অতএব —

হে মুসলিম

ইসলামী দেশগুলো বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে নিপতিত। এ দেশগুলোর আসমান-যমীনের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব বিরাজমান। তারা আমাদের সমাজের শোষণ-পেষণের দ্বার খুলে দিয়েছে। আমাদের শরীরের রক্তধারা চুষে চুষে খাচ্ছে। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। আমাদের মান-ইযযত নিয়ে হোলি খেলছে। আমাদেরকে ধর্মবিমুখ করে তুলছে।

হে মুসলিম! তোমাদের সমাজে এমন আইন প্রচলিত রয়েছে যা তোমাদের ধর্ম ও সভ্যতার সাথে কোনই সম্পর্ক রাখছে না। এটা তোমাদের উপলব্ধি ও

ধর্মবিশ্বাসের অপমান বৈ কিছু নয়। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির প্রসার ঘটছে। এ সাম্রাজ্যবাদী অভিযান তোমাদের বিরুদ্ধেই চালানো হচ্ছে। এরা অন্যায়-অবিচার শোষণ-পেষণ ও লুটতরাজকে আইনের রূপরেখায় রূপান্তরিত করে কাফিরী রাষ্ট্রের জন্য বৈধতার সনদ সরবরাহ করছে।

হে মুসলমান বন্ধুরা ! এই হচ্ছে তোমাদের রাষ্ট্র ও সরকার, যারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করছে। ইসলামী আইনগুলোকে অকর্মণ্য করে দিয়েছে। ইসলামের নিঃস্বার্থ সেবক ও কর্মীবাহিনীর উপর নানাবিধ অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে এবং পাশ্চাত্যের শক্তিগুলোর সাথে ইসলামকে নাস্তানাবুদ করার জন্য ষড়যন্ত্রজাল বুনছে। হে মুসলিম ভাইয়েরা ! এই হচ্ছে তোমাদের জীবনের সামাজিক ব্যবস্থাপনা, যার প্রতি তোমাদের মন যেমন খুশি নয় তেমনি স্বভাব- প্রকৃতিও সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু তোমাদের রাষ্ট্রসমূহ এ শাসন ব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় জোরপূর্বক তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ দুষ্ট শাসন ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে তদস্থলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামের দাবি। তোমাদের চলার পথ হতে সাম্রাজ্যবাদ ও আমাদের রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্ট বাধাগুলো অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের অগ্রযাত্রা বিলম্বিতই থাকবে। আসুন। আমাদের জান-মাল এ উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কুরবান করি এবং সম্মিলিতভাবে আমাদের বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় অবতীর্ণ হই। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লড়াইর জন্য সকলের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

الذين ينصرون الله... الله قادر على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون –

যাঁরা আল্লাহ্কে সাহায্য করেন.... আল্লাহ্ স্বীয় কাজে খুবই শক্তিশালী কিন্তু অধিকাংশ লোক তা অবগত নয়।

ইফাবা–২০০৬–২০০৭—প্র / ২৪২১(উ)—৩,২৫০